খবরের ঘণ্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

শ্রী মায়ের আবির্ভাব

একুশে ফেব্রুয়ারী

অমর একুশে

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

- নির্ভাবনায় বাঁচতে হলে......শ্রীমা
- বাংলা ভাষা শিখলে চাকরির নিশ্চয়তা দরকার
- ভাষা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা
- বাংলা ভাষা আন্দোলন ও ডাঃ মুকুন্দ মজুমদার

জন্ম

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮

প্যারিস, ফ্রান্স

মিরা আলফাসা (২১শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮---১৭ই নভেম্বর ১৯৭৩) তাঁর অনুগামীদের কাছে ‘ **দ্য মাদার**’ বা **শ্রীমা** নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক গুরু, জাদুবিদ্যাবিদ এবং শ্রীঅরবিন্দের একজন সহযোগী। **শ্রীঅরবিন্দ** তাঁকে তাঁর সমান যোগসাধক মর্যাদার মনে করতেন। তাঁকে তিনি **দ্য মাদার বা শ্রী মা** নামেই ডাকতেন। তিনিই শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং **অরোভিলকে** একটি সার্বজনীন শহর হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন।

“ একদিনে যে কেউ তার নিজের স্বভাবকে কাটিয়ে উঠতে পারে না। তবে ধৈর্য্য এবং সহনশীলতার ইচ্ছার সাথে বিজয় অবশ্যই আসবে। ”--শ্রীমা

“সদিচ্ছা এবং বিশ্বাস থাকলে কিছুই অসম্ভব নয়।”--শ্রীমা

DIVINE LIFE FOUNDATION

(A CENTRE FOR RESEARCH & STUDY ON INTEGRAL YOGA OF SRI AUROBINDO)

NANI GOPAL MANSION ,GROUND FLOOR ,MILAN PALLY ,SILIGURI

TIMINGS : MONDAY & WEDNESDAY (7 P.M TO 9 P.M),CONTACT NO. SECRETARY 9434046158

SILIGURI TERAI B.ED COLLEGE
&
SILIGURI PRIMARY TEACHERS' TRAINING COLLEGE
Recognised by NCTE, Ministry of HRD
Govt. of India
Affiliated to : WBUTTEPA & WBBPE
Admission Open for B.ED & D.EL.ED Course
Web : www.slgttc.com
E mail : slgtbc@gmail.com
CONTACT NO : 97350 61656
DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427
TERAI INTERNATONAL SCHOOL
Registration No : SO185236
HOSTEL ADMISSION FOR - CLASS V to VIII
DAY BOARDING FACILITY
FULL BOARDING FACILITY
TRANSPORTATION FACILITY
EXTRA CURRICULUM ACTIVITY
উত্তরবঙ্গের
একমাত্র বাংলা মাধ্যমের
DAY BOARDING এর
সুবিধাযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
E mail : terai.tis@gmal.com
CONTACT NO : 75869 09494
DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427

।। श्री माँ ।।

আর. জী.

বস্ত্র বিপনী

RED IS THE COLOR OF PHYSICAL ACTIVITY, CREATIVITY

Ajay Goyal

Mob. : 94340-46134

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

- TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
  M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS
- SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
  M.S. ROD M.S. FLATS &
  TORKARY BAR

MANUFACTURING :

- SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
  GREEN TEA FACTORY
- CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
  HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS
- SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
  C.I. CASTING

AGRICULTURE :

- BASANTA AGRICO-
  PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

- PAUL AUTOMOBILES
- M&C IRON STORES
- VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

খবরের ঘন্টা

শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355
Monthly Magazine
Vol. VI Issue-8
1st February-28th February 2023 **LANGUAGE DAY**
ষষ্ঠ বর্ষ-সংখ্যা-৮ দেশপ্রেম ফাল্গুন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
ফেব্রুয়ারী ২০২৩ ভাষা দিবস

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ করিমুল হক (পদ্মশ্রী তথা বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা) জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), বাবলু তালুকদার (ডুয়ার্স হিউম্যান কেয়ারসোসাইটি), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), সজল কুমার গুহ (সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি, শিলিগুড়ি শাখা)

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh
Sub Editor : Arpita Dey Sarkar
Cover : Sanjoy Kumar Shah
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্ত্বাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

মায়ের জীবনী......................পশুপতি ভট্টাচার্য্য......................০৩
মা স্বয়ং ভগবতী......শ্রী অরবিন্দ (অনুবাদ ঃ পশুপতি ভট্টাচার্য্য...০৬
নির্ভাবনায় বাঁচতে হলে.......শ্রীমা (অনুবাদ ঃ তীর্থ সরকার).......০৯
ভগবান বলি কাকে.........................শ্রীমা............................১১
বর্তমান বিশ্ব-সংকটের কারণ ও গতি..শ্রীমা (অনুবাদ ঃ তীর্থ সরকার)..১৫
কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা.........মুসাফীর.............১৭
বাংলা লিপির আদিকথা......................অনিল সাহা.................২০
বাংলা ভাষা শিখলে চাকরির নিশ্চয় দরকার...ধ্রুব সরকার..........২২
ভাষার প্রতি ভালোবাসা থেকেই এই বয়সে লড়াই করছি...........................সজল কুমার গুহ..........................২৩
ভাষা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা...............কবিতা বনিক............২৫
২১শে ফেব্রুয়ারী ও কিছু কথা.........নির্মলেন্দু দাস.....................২৭
বাংলা ভাষা আন্দোলন ও ডাঃ মুকুন্দ মজুমদার....................স্মৃতিকণা মজুমদার.................২৮
বই মেলায় বাংলা বইয়ের প্রতি আগ্রহ.........গণেশ বিশ্বাস..........৩০
মাতৃভাষা বাংলাকে ভালবাসতে হবে....ডঃ রতন বিশ্বাস............৩১
বাংলা ভাষা নিয়ে আন্দোলন চাই...............বীরেন চন্দ.............৩৪
একুশে ফেব্রুয়ারী স্মরণে...............অনিল চন্দ্র রায়...................৩৭
সব ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষা চাই...............অর্চনা মিত্র.............৩৮
দিকে দিকে মাতৃভাষা বাংলা চাই.................খোকন ভট্টচার্য.......৩৮
৭১ বছর আগে সেই স্মরণীয় দিন...............আশীষ ঘোষ..........৩৯
মাতৃভাষা দিবস পালন তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে.............................পুষ্পজিৎ সরকার.........৪০
ফেব্রুয়ারী মাস জুড়েই বাংলাদেশে অনুষ্ঠান হয়.........................পারভেজ চৌধুরী............................৪১
জয় বঙ্গ ! আমি ডাঃ মজুমদার বলছি...............বাপি ঘোষ..........৪২

ঃঃ কবিতা ঃঃ

কচলিয়ে চোখ...........................দুলাল দত্ত............................১৯
শহিদ স্মরণে প্রদীপ ধরি.......................গোপা দাস..................২১
অমর একুশ......................তন্ময় ঘোষ..................................২১
২১শে ফেব্রুয়ারী......................নির্মলেন্দু দাস.........................২৬
মিষ্টি মধূর বাংলা ভাষা..............মুকুন্দ দাস.............................২৭
ন্যায়............................প্রেণিতা দত্ত.......................................২৯
মাতৃভাষা দিবসের কবিতা.......................সুশ্বেতা বোস.............৩২
আমাদের মাতৃভাষা.......................সজল কুমার গুহ.................৩৫
আত্ম মর্যাদা......................রিয়া মুখার্জী..................................৩৬

ঃঃ প্রতিবেদন ঃঃ

ভাষা সংগ্রামী মুকুন্দবাবুর প্রসঙ্গ উঠতেই কেঁদে ফেলছেন এই বৃদ্ধা...৩৩
২৬ কোটি মানুষের ভাষা বাংলা ভাষা, এই ভাষার রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রাপ্য...৩৬

You Tube Link :
https://youtube.com/@KHABARERGHANTA
Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/slgkg/
Google Web Portal :
www.khabarerghanta.in

অমৃত—কথা

দেবভাষা

শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দ ঃ বিষয় রাষ্ট্রভাষা

এক) সংস্কৃত ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত ।

দুই) প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক ভাষা পারস্পরিক সংযোগরক্ষাকারী ভাষা হওয়া উচিত।

তিন) ইংরাজি অর্ন্তরাষ্ট্রীয় ভাষা হওয়া উচিত।

সরল, সহজ (অতি সহজ নয়) সংস্কৃত সর্বজনগ্রাহ্য ও গ্রহনীয় হবে। কারণ এটা কোনো প্রাদেশিক ভাষা নয়। এটা ভারতের আত্মার দেবভাষা।

সম্পাদকীয়

ঐতিহ্যের একুশে ফেব্রুয়ারি

একুশে ফেব্রুয়ারি। ইতিহাসে এক ঐতিহ্যমন্ডিত দিন। এই দিনেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়। পৃথিবীর সব ভাষাই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ভাষাই ছোট নয়। যার যা মাতৃভাষা তাঁর কাছে সেটাই বিশেষ প্রাণের ভাষা। আর মানুষ যত ভাষা শিখবে ততই মঙ্গল। পৃথিবী আজ ছোট নয়। যার যত ভাষা দখলে সে ততই পৃথিবীর বহু প্রান্তে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে তাতে সন্দেহ নেই। সেক্ষেত্রে ইংরেজি গোটা বিশ্বের মধ্যে সমন্বয়রক্ষাকারী গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। ইংরেজি তাই অবশ্যই জানা প্রয়োজন। ইংরেজি না জানলে সেই জাতি পিছিয়ে পড়বে। অতএব ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি নিজ নিজ মাতৃভাষা জানা দরকার। মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রহন মাতৃকোলে শিশুর অবস্থানের মতোই বিষয়। আমাদের এই খবরের ঘন্টা পত্রিকা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়। এর বেশিরভাগ পাঠক সংখ্যা বাংলা ভাষাভাষী। তাই আমরা বাংলা ভাষার কথাই এখানে বেশি করে বলবো। পৃথিবীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষা বাংলা। এই বাংলা ভাষার ঐতিহ্যও রয়েছে। বাংলা ভাষায় এমন অনেক সৃজন হয়েছে যা পৃথিবীর অন্য সব মানুষকে আজও পথ দেখায়। কাজেই এই বাংলা ভাষা যাতে অবহেলার শিকার না হয় তা আমাদের দেখতে হবে। বাংলা ভাষাকে আমাদের সকলে মিলে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। নতুন প্রজন্মকে বোঝাতে হবে, তোমাদের ইংরেজি মাধ্যমে পড়ে ইংরেজি যেমন শিখতে হবে তেমনই নিজের মাতৃভাষাকে অবহেলা করা চলবে না। মাতৃভাষা বাংলা না শিখলে তোমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

ঐতিহাসিক একুশেই আবির্ভাব ঘটেছিল শ্রীমায়ের। শ্রীমায়ের পুরো নাম মীরা আলফাসা বা মীরা রিচার্ড। তিনি ছিলেন ফরাসি আধ্যাত্মিক গুরু । তাছাড়া তিনি ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যা এবং সহযোগি। ১৯১৪ সালের ২৯ মার্চ শ্রীঅরবিন্দের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে তিনি পন্ডিচেরী আশ্রমে বসবাস শুরু করেন। শ্রী অরবিন্দ তাঁকে দিব্য মায়ের অবতার হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ১৮৭৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ফ্রান্সের প্যারিসে তাঁর জন্ম। তখন তাঁর নাম ছিলো ব্লাঞ্চ রাচেল মীরা আলফাসা। মানবজাতির কল্যানে তিনি অনেক আলোর পথ দেখিয়ে গিয়েছেন। ১৯৭৩ সালের ১৭ নভেম্বর ৯৫ বছর বয়সে তিনি প্রয়াত হন। কিন্তু তাঁর দেখানো পথে এগিয়ে জীবনে নতুন আলোর দিশা পেয়ে চলেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ। আজ যখন পৃথিবী অশান্ত, আজ যখন চারদিকে নেতিবাচক ভাবনার ছড়াছড়িতে মানুষ কষ্টের জীবন অতিবাহিত করছেন তখন শ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক আলোর পথ এক নতুন প্রাণের সঞ্চার করছে। এবারে খবরের ঘন্টার ২১শে ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় তাই শ্রীমায়ের ওপর আলোকপাত করা কিছু লেখা প্রকাশিত হলো। সহযাগিতায় রয়েছে ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশন, মিলন পল্লী, শিলিগুড়ি।

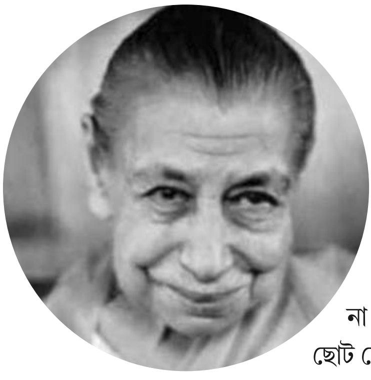

মায়ের জীবনী

১৮৭৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে প্যারিস শহরে মা জন্মগ্রহন করেন। শ্রীমায়ের আসল নাম মিরা আলফাসা, জন্ম ফ্রান্সের প্যারিসে, পিতা ছিলেন সেখানকার একজন ধনী ব্যাঙ্ক মালিক। কিন্তু এঁরা আদিম ফরাসী নন । শোনা যায়, এঁদের পূর্বপুরুষেরা এসেছিলেন মিশর বা তৎসন্নিকটস্থ কোনো দেশ হতে।

মায়ের আগেকার জীবনের ইতিবৃত্ত কেউই বিশেষ কিছু জানে না এবং জানলেও তা বলতে চায় না। তার কারণ মা নিজে এটা পছন্দ করেন না। তিনি বলেন, সে-সব কথা জেনে কিছু লাভ নেই। কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েদের ক্লাসে এমনি গল্প করতে করতে অনেক সময় তাঁর শৈশবের ও আগেকার জীবনের কোনো কোনো ঘটনার কথা তিনি আপন খুশিতে বলে ফেলেছেন। সেই সব ক্লাসে বড়োরাওকেউ কেউ গিয়ে বসেছে। তাদের মধ্যে দুএকজন সেই সব কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রেখেছিল। এখানে তার থেকেই কয়েকটি উদ্ধৃত করে দেওয়া হচ্ছে,কারণ মায়ের নিজের মুখে বলা এই সব সত্যকাহিনী থেকে তাঁর পূর্ব জীবনের সম্বন্ধে কিছু কিছু আন্দাজ করা যাবে। বহু কাহিনীর ভিতর থেকে এগুলি বেছে নেওয়া হয়েছে, তবে পর পর তারিখ অনুসারে এগুলিকে সাজিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। মায়ের নিজের জবানীতেই এগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

১)“ সাত বছর বয়সের আগে আমি লিখতে বা পড়তে শিখিনি। কেউ পারেনি আমাকে শেখাতে। অথচ চার বছর বয়স থেকেই আমার যোগ আরম্ভ। বেশ মনে আছে, আমার জন্য একটি ছোট্ট চেয়ার কেনা হয়েছিল, তাতে বসে আমি তন্ময় হয়ে যেতাম। তখন আমার মাথার উপর একটা প্রচন্ড আলো এসে মস্তিস্কের মধ্যে যেন তোলপাড় করতে থাকত। এর কারণ অবশ্য কিছুই বুঝতে পারতাম না, তখন কোনো কিছু বোঝবার বয়সই নয়। কিন্তু ক্রমশ যেন বোধ হতে লাগল যে বিশেষ কোনো একটা বড়ো কাজ আমাকে দিয়ে করানো হবে যার সম্বন্ধে অন্য কেউ জানে না। ---তারপর সাত বছর বয়সে একদিন আমার দাদার সঙ্গে রাস্তা দিয়ে চলেছি, সুমুখে একটা মস্ত সাইনবোর্ড দেখে দাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম--ওতে কি লেখা রয়েছে? দাদা আশ্চর্য হয়ে বললেন, তুই কি দেখতে পাচ্ছিস না? তখন আমি বললাম, আমি যে পড়তে জানি না। এই কথা শুনে দাদা আমাকে খুব ঠাট্টা করতে লাগলেন। তৎক্ষনাৎ বাড়ি ফিরে আমি নিজেই একটা বই নিয়ে অক্ষর পরিচয় আরম্ভ করলাম। তারপর ইস্কুলে ভর্তি হলাম, আর তিন বছর পর থেকেই ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করতে থাকলাম ও প্রতি বছর প্রাইজ পেতে লাগলাম।চৌদ্দ বছর বয়সে আমি এক ছবি আঁকার স্টুডিওতে গিয়ে ছবি আঁকতে শিখতাম। কিন্তু তখন একবারও আমার মুখে হাসি ফোটেনি, সর্বদাই গম্ভীর হয়ে থাকতাম আর খুব কম কথা বলতাম। আমাকে এমন ধীর স্থির দেখে নিরপেক্ষ ভেবে সব-কিছু বিবাদ মেটাবার ভার আমারই উপর পড়ত।”--

২) “আমার বোধ হয় তখন বারো বছর বয়স। প্যারিসের কাছাকাছি এক প্রকান্ড বনে (Fontainebleu) আমি প্রায়ই বেড়াতে যেতাম। সেটি ওখানকার বিখ্যাত বন। দু হাজার বছরেরও পুরনো অনেক গাছ আছে সেখানে। যদিও তখন আমাকে ধ্যানের তাৎপর্য কী তা কেউ শেখায়নি, তবু ঐ সব গাছের তলায় বসলেই আমি তন্ময় হয়ে যেতাম। তাদের সঙ্গে তখন যেন অন্তরের একটা গভীর সংযোগ বোধ করতে থাকতাম আর তাতে সত্যিকার একটা আনন্দ অনুভব করতাম। আমার চেতনা যেন সেই সব গাছের সঙ্গে তখন এক হয়ে যেত, আর আশ্চর্যের কথা এই যে গাছের পাখিগুলো আর কাঠবিড়ালীরা পর্যন্ত আমার সামনে এসে বসত, এমন কি তারা আমার গায়ের উপর দিয়ে ছোটাছুটি করে খেলা করে বেড়াত। তোমরাও চেষ্টা করলে এটা সহজেই অভ্যাস করে নিতে পারো। বাইরে যখন বেড়াতে যাও তখন যদি কোনো বড় গাছতলায় কিছুক্ষন শান্ত হয়ে বসে থাকো তার গুঁড়ির গায়ে ঠেসান দিয়ে, তাহলে ক্রমশ অনুভব করতে থাকবে তার চেতনাকে, তার প্রাণের স্পন্দনকে। তখন বুঝতে শিখবে যে মানুষের সঙ্গে ওদেরও হৃদ্যতা কত গভীর হতে পারে, ঠিক যেন একজন বন্ধুর মতো। বস্তুতঃ এমন কোনো কোনো গাছ আছে যারা মানুষের বন্ধু হতে চায়। স্নেহের ভাব তাদের মধ্যে প্রচুর, আশ্রয় দেবার মতো উদারতা মানুষের চেয়েও তাদের বোধ হয় বেশি রকম। ওদের প্রতি সহানুভুতি করতে শিখলেই এ-সব জিনিস প্রত্যক্ষ জানতে পারা যায়। একবার একটা মস্ত গাছকে

“খুবই স্থির হয়ে থাকো। তাহলেই দেখতে পাবে, ভগবানের শক্তি ও সাহায্য ও আশ্রয় সর্বদাই তোমাকে ঘিরে আছে। ”--শ্রীমা

সে আমাকে স্পষ্ট অনুরোধ জানাচ্ছে। ”

৩) ‘‘এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমি গিয়েছিলাম উত্তর আফ্রিকার আলজিরিয়া প্রদেশের অর্ন্তগত ক্লেমসেল নামক শহরে।উত্তরে তার আলজিরিয়া, দক্ষিণে সাহারা মরুভূমি, পশ্চিমে মরক্কো, পূর্বে টিউনিসিয়া। গ্রীষ্মকালে সেখানে প্রচন্ড গরম, সে গরমের কথা তোমরা কল্পনা করতে পারবে না। আমি ওখানে গিয়েছিলাম সেখানকার তেওঁ নামক একজন মস্ত গুণীর কাছে গুহ্যবিদ্যা (Occultism) শিক্ষা করতে, তিনি কোন জাতের লোক তা জানা নেই, সম্ভবত পোল দেশীয় ইহুদী। সেখানে প্রত্যহ দুপুরে সেই প্রচন্ড গরমে আমি প্রকান্ড এক ওলিভ গাছের তলায় গিয়ে ধ্যানে বসতাম। এতে আমি সেখানকার সেই প্রচন্ড উত্তাপ অনায়াসে সহ্য করতে পারতাম। একদিন এইভাবে দুপুরে গিয়ে যথারীতি ধ্যানে বসেছি। গভীর ধ্যানে তন্ময় হয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ যেন আমার কেমন একটা অস্বস্তিবোধ হতে লাগল।তখন চোখ খুলে দেখি, ঠিক আমার সামনে প্রায় তিন-চার হাত দূরে মস্ত এক গোখরো সাপ, সে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে এক একবার আমার দিকে হেলে আসছে আর হিস হিস করে একটা শব্দ করছে। ওখানে এই সব গোখরো সাপকে বলে নাগা, এদের বিষ অতি সাংঘাতিক। প্রথমে বুঝতে পারিনি যে আমার উপর তার কিসের এত আক্রোশ। হঠাৎ খেয়াল হলো যে আমি তার গর্তের মুখটা বন্ধ করে বসে আছি, তাই।গাছের যেখানটায় আমি ঠেসান দিয়ে আছি, তার নিচেই একটা গর্ত আছে। কিন্তু এখন কি উপায়? আমি যদি এখন একটুও নড়ি তাহলেও ও আমাকে ছোবল দেবে। কিন্তু ভয়ে তখন আমি ঘাবড়ে গেলাম না, কিংবা একটুও চঞ্চল হলাম না। হঠাৎ আমার মাথায় এই বুদ্ধি এল যে ওর চোখের উপর চোখ রেখে একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে থাকতে হবে, ওকে বশীভূত করে ফেলতে হবে। আমি তাই করলাম। কিছুক্ষন পরে সাপের হাবভাবটা যেন বদলে আসছে বলে মনে হল, তার হিস হিস করা থেমে গেল। তখন খুব ধীরে ধীরে একটা পা আমার গুটিয়ে নিলাম, অথচ চোখের উপর চোখ সমানেই রেখে দিয়েছি। তারপর তেমনিভাবে আরো একটি পা গুটিয়ে নিলাম এবং আরো তীব্রভাবে আমার শক্তি প্রয়োগ করতে থাকলাম। ততক্ষনে সেই বিষধর একেবারে কাবু হয়ে পড়েছে, সে হঠাৎ ফণা নামিয়ে সেখান থেকে সরে তাড়াতাড়ি পাশের পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন তেওঁ-কে এই ঘটনার কথা বলায় তিনি বললেন,ও সাপটা ওখানে থাকে, আমরা সবাই জানি। স্নান করে এসে ও ঘরে ঢুকতে চাইছিল, তুমি ওর রাস্তা আগলে বসেছিলে তাই অমন চটে উঠেছিল। ওকে যদি একটু করে দুধ খাওয়াতে পারো তাহলে তোমার সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়ে যাবে। এই ঘটনাটির পর থেকে কিন্তু আমার সাপের ভয় একেবারে ঘুচে গেল।এর আগে সাপ দেখলেই আমার দেহটা যেন কুঁকড়ে যেত, দেহের মধ্যে ওদের সম্বন্ধে কি একটি বিরুদ্ধ ভার ছিল কিছুতেই তা দমন করতে পারতাম না। কিন্তু সেদিন থেকে ঐরোগ আমার একেবারে সেরে গেল।”

৪) ‘‘আলজিরিয়ার ক্লেমসেল শহরে মঁসিয়ে তেওঁর যে বাড়িতে আমি থাকতাম, সেখানে একটি পিয়ানো ছিল। এ-কথা শুনে ফ্রান্স থেকে আসবার সময় আমার গানের স্বরলিপি বইগুলি আমি সঙ্গে নিয়েছিলাম। ওখানে থাকতে পিয়ানোতে সেই গানগুলি আমি প্রায়ই বাজাতাম। একদিন বহুক্ষন ধরে পুরো একটি সিমফনি বাজিয়ে যেমনি আমি থেমেছি, অমনি কানে একটা শব্দ এলো, ‘কোয়াক’, ‘কোয়াক’ । এ কিসের শব্দ !চারিদিক খুঁজতে খুঁজতে দেখি দরজার সামনেই এসে দাড়িয়েছে এক নবাগত অতিথি, মস্ত এক কোলা ব্যাঙ। তার বড় বড় চোখ দুটি আগ্রহে বিস্ফারিত হয়ে রয়েছে। সে আমার দিকে চেয়ে বলল,‘কোয়াক’। তখন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম তার ঐ ভাষার অর্থ, সে বলছে ‘আবার বাজাও’। আমি তখন আবার খানিকটা পিয়ানো বাজালাম। সেইখানে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগল। এর পরেও অনেক দিন দেখেছি, যখনই আমি বাজাতাম তখনই সে কোথা থেকে এসে হাজির হতো। অমনি ড্যাবডেবে চোখ চেয়ে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে যেন মুগ্ধ হয়ে বাজনা শুনতো।আর বাজনার শব্দ যেই যেই থেমে যেত তেমনি তার গলা থেকে আপত্তিজ্ঞাপক শব্দ হতো, ‘কোয়াক’।

৫)‘‘দ্বিতীয়বারে ক্লেমসেল থেকে ফেরবার সময় তেওঁ আমার সঙ্গে এসেছিলেন ইউরোপ বেড়িয়ে যেতে। জাহাজ সমুদ্রপথে আসতে আসতে কিছুদূর পরেই প্রবল ঝড় উঠলো। সমুদ্রের ঢেউগুলি উত্তাল নৃত্য শুরু করে দিল, জাহাজটা এপাশে ওপাশে কাত হয়ে অনবরত টলমল করতে লাগল। ভয়ে ভাবনায় যাত্রীদের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। কেউ কেউ কান্না-কাটি শুরু করে দিলে। ক্যাপটেন পর্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগলেন,স্পষ্টই বললেন--‘কী দুর্ভোগেই পড়া গেল। যাত্রীরা বিপন্ন হয়ে পড়ছে। ’ তেওঁ আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন,‘তাহলে থামাও গিয়ে।’ ক্যাপটেন এ-কথা শুনে আশ্চর্য হলেন, বিশেষ কিছুই বুঝলেন না। কিন্তু আমি বুঝেছিলাম। তখন আমি আমার কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। তারপর নিজের দেহ ছেড়ে মুক্ত সমুদ্রের উপর বিচরন করতে লাগলাম। তখন দেখি অসংখ্য অশরীরী আত্মা সেই সমুদ্রতরঙ্গে পাগলামি করে বেড়াচ্ছে। তারাই দুষ্টামি করে জাহাজটাকে ধরে দোলা দিচ্ছে, এই দুস্প্রবৃত্তির দ্বারা তারা যেন খুব আমোদ পাচ্ছে। আমি নম্র

ভাবে খুব মিস্টি করে তাদের বুঝিয়ে বললাম, এই সব ভয়-কাতর নিরীহ প্রাণীদের কষ্ট দিয়ে তোমাদের লাভটা কি হচ্ছে। ও সব ছেড়ে দাও, এদের নিষ্কৃতি দাও। আধ ঘন্টা যাবৎ ঐকান্তিকভাবে তাদের বাপুবাছা করতে করতে শেষে তারা তুষ্ট হয়ে এই দুষ্কার্য থেকে নিবৃত্ত হলো, সমুদ্রের জলও তখন প্রশান্ত হয়ে গেল। আমি আবার আমার দেহে ফিরে গেলাম। তারপর বাইরে বেরিয়ে দেখি ঝড় থেমে গেছে, যাত্রীরা আনন্দে কোলাহল করছে।"

মা নিজে তাঁর পূর্ব জীবন সম্বন্ধে কারো সঙ্গে আলোচনা করতে চান না। এ বিষয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন করলে তিনি নীরব থাকেন। একবার ১৯২০ সালে মাকে কেউ প্রশ্ন করে, ''তিনি ভারতে এলেন কেন, আর শ্রীঅরবিন্দকেই বা জানলেন কেমন করে? " তিনি একটি পত্রে তার যা উত্তর দিয়েছিলেন তা 'প্রবর্তক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।এখানে সেই পত্রখানি অনুবাদ করে দেওয়া হলো--

''তুমি জানতে চেয়েছিলে যে কখন কেমনভাবে এটা আমার প্রথম বোধ হলো যে জগতে আমি বিশেষ কোনো ভগবৎ-কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি,আর কেমন করে আমি শ্রীঅরবিন্দের সন্ধান পেলাম? এ প্রশ্নের যে উত্তর আমি দেব বলেছিলাম, তাই সংক্ষেপে জানাচ্ছি।

''আমার আদিষ্ট কর্ম সম্বন্ধে প্রথম জ্ঞান যে আমার কখন হয়েছে, এ-কথা আমার নিজেরই পক্ষে বলা কঠিন। আমার মনে হয় যে এই চেতনাকে নিয়েই আমি জন্মেছিলাম, পরে মন ও মস্তিস্কের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গেই সেই চেতনা ক্রমশ পরিস্ফুট ও পূর্ণতর হয়ে উঠল।

''এগারো থেকে তের বছরের বয়সের মধ্যে উপর্যুপরি আমার মধ্যে এমন সব আধ্যাত্মিক অনুভূতি আসতে লাগল যাতে আমি কেবল যে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে গেলাম তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানলাম যে ভগবানের সঙ্গে মানুষের মিলন হওয়াও নিশ্চয়ই সম্ভব, মানুষের চেতনাতে ও কর্মে তাঁর অভিব্যক্তির পূর্ণ উপলব্ধি মেলাও সম্ভব, আর দিব্যজীবন লাভের দ্বারা জগতে তাঁকে অভিব্যক্ত করতে পারাও সম্ভব। এই অনুভূতি ও বোধ এবং কি ভাবে জগতে একে সার্থক ও কার্যকরী করে তোলা যায় তারই শিক্ষা আমি পাচ্ছিলাম আমার ঘুমের অবস্থায় নানারকম গুরুর কাছ থেকে, তাদের কাউকে কাউকে আমি এই স্থূল জগতেও পরে দেখতে পেয়েছি। তারপরে যখন আমার আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উন্নতি খানিক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে তখন এদেরই মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার আধ্যাত্মিক ঘনিষ্ঠতা স্পষ্টতর ও প্রগাঢ় হয়ে উঠল, তখন ভারতের দর্শনতত্ব ও ধর্মশাস্ত্রগুলির সম্বন্ধে আমি খুব কম কথাই জানতাম, তবু তখন থেকে আমি তাঁকে নিজেই 'কৃষ্ণ' বলে ডাকতে শুরু করলাম। আমি মনে মনে জানতে পারলাম যে পৃথিবীতে তাঁর সঙ্গে একদিন আমার সাক্ষাৎ হবেই , এবং তাঁরই সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাকে আমার আদিষ্ট দিব্য কর্ম সাধন করতে হবে। ভারতবর্ষকেই আমি আমার মাতৃভূমি বলে বরাবর ভালোবেসে এসেছি --১৯১৪ সালে আমার এ দেশে এসে উপস্থিত হবার প্রথম সৌভাগ্য ঘটে।

''শ্রীঅরবিন্দকে দেখামাত্রই আমি চিনতে পারলাম, ইনিই আমার সেই আগেকার পরিচিত বিশেষ ব্যক্তি যাঁকে আমি কৃষ্ণ বলে ডেকেছি। --এই যথেষ্ট , এতেই তুমি বুঝতে পারবে, কোথা থেকে আমার এমন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে এখানে এই ভারতে ওঁর পাশেই আমার স্থান, আর ওর সঙ্গে মিলিত হয়েই আমার যা কিছু কাজ।"

শ্রীঅরবিন্দকে কেউ একজন প্রশ্ন করেছিল--''অনেকে বলে যে মা আগে ছিলেন আমাদেরই মতো মানুষ, তারপরে তিনি ক্রমশ জগন্মাতার স্বরুপ হয়ে উঠলেন, একথা কি ঠিক?''তাতে শ্রীঅরবিন্দ বললেন যে তা নয়, তিনি গোড়া থেকেই তাই। তিনি বললেন,''ভগবান যখন মানুষরুপে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি মানুষের বাহ্য প্রকৃতি নিয়ে এখানে থেকে তাদের দেখিয়ে দেন যে কেমন করে সাধারণ মানুষ হয়েও এ-পথে চলা যায়, কিন্তু তাই বলে তিনি তাঁর 'ভগবত্তাকে ছেড়ে আসেন না।এ ক্ষেত্রে তাঁর ভিতরকার দিব্যচেতনারই ক্রমিক অভিব্যক্তি ঘটতে থাকে, সেটা গোড়ায় মানুষ থেকে পরে ভগবানে রুপান্তরিত হওয়া নয়। মা তাঁর শৈশবকাল থেকেই ভিতরে ভিতরে ছিলেন মানুষের উপরে। সুতরাং অনেকে যা বলে সে কথা ভুল।"

(লিখেছেন পশুপতি ভট্টাচার্য)

"দীনতা ও আন্তরিকতা এই দুটি হল রক্ষাকবচ। এগুলি না থাকলে প্রতিটি পদক্ষেপই বিপজ্জনক, এগুলি থাকলে সাফল্য সুনিশ্চিত।"--শ্রীমা

মা স্বয়ং ভগবতী

শ্রীঅরবিন্দ

প্রশ্ন ঃ আপনার 'মা' বইখানিতে আপনি আমাদের এই মায়ের কথাই বলেছেন না কি?

শ্রীঅরবিন্দের উত্তর ঃহ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ ইনিই কি ব্যষ্টিরুপধারণী স্বয়ং জগন্মাতা---অর্থাৎ তিনিই কি আসেননি তাঁর বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত দুই বৃহত্তর স্বরুপের শক্তিকে একত্রেই এক মরদেহে ধারণ করে?

শ্রীঅরবিন্দের উত্তর ঃ হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ তাহলে স্বয়ং আদ্যাশক্তি জগন্মাতাই কি আসেননি আমাদের প্রতি গভীর স্নেহের আকর্ষনে, নিতান্ত আমাদেরই মধ্যে, আমাদের এই ভ্রান্তি ও মিথ্যা ও তমিস্রা ও মৃত্যুঘেরা জগতে।

শ্রীঅরবিন্দের উত্তর ঃ হ্যাঁ।

মা স্বয়ং ভগবতী

প্রশ্ন ঃ অনেকের ধারণা যে মা ছিলেন মানবী, কেবল এখনই হয়েছেন জগন্মাতার প্রতিরুপ। তারা বলে ঃ মায়ের আগেকার জীবনের লেখা প্রার্থনা-গুলিই এ কথার প্রমানস্বরুপ। কিন্তু আমার নিজের মনের যা ধারণা, আমার অন্তঃপুরুষের যা অনুভূতি, তাতে এই বোধ হয় যে স্বয়ং ভগবতীই এসেছেন আমাদের মা হয়ে, ইচ্ছা করেই তিনি এখানকার দুঃখকষ্ট, বিমূঢ়তা ও অজ্ঞানতার ছদ্মবেশ নিয়েছেন , যাতে আমাদের মধ্যে মিলে থেকে আমাদের মত মানুষকে জ্ঞানের দিকে শান্তির দিকে , সুগভীর বিশুদ্ধ আনন্দের দিকে ও ভগবানের দিকে নিজেই পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। আরও আমার মনে হয় যে মায়ের সেই প্রার্থনাগুলি লেখবার উদ্দেশ্যই তাই, যাতে তিনি আমাদের জিজ্ঞাসু অন্তরাত্মাকে নিজেই করে দেখিয়ে দিতে পারেন যে কেমন করে আন্তরিকভাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয়।

শ্রীঅরবিন্দের উত্তর ঃ হ্যাঁ, ঠিকই তাই, ভগবান ইচ্ছাপূর্বক এমনি মানুষের রুপ ধারণ করেন, মানুষেরই মত বাহ্য প্রকৃতিকে অবলম্বন করেন, যাতে মানুষেরই রাস্তায় চলে দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখিয়ে দিতে পারেন কেমন করে এরাস্তায় চলতে হয়। কিন্তু তাই বলে তাঁর নিজস্ব ভগবৎ সত্তা তখনও লোপ পায় না।এ কেবল তাঁর একটা আবির্ভাব , অর্থাৎ ক্রম-প্রকাশিত ভগবৎ চেতনার আবির্ভাব, প্রথমে সাধারণ মানুষের থেকে পরে ভাগবত সত্তায় পরিণত হওয়া ঠিক এ জিনিস নয়। মা অতি শৈশব থেকেই তাঁর আন্তর চেতনাতে মানুষীভাবের উপরে ছিলেন। সুতরাং ''অনেকে '' এর সম্বন্ধে যা মনে করে তা ভুল। (১৭-৮-১৯৩৮)

মা যে প্রত্যেকের সঙ্গে স্বতন্ত্র রকমের আচরন করেন, এটি তাঁর নিজের মনের কোন নির্দিষ্ট মতলব অনুযায়ী নয়, এটি তাদেরই প্রত্যেকের প্রকৃত ও প্রয়োজন অনুযায়ী। নতুবা তিনি যদি সকলের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতেন যেন সকলে একই ধরনের যন্ত্র এবং সে যন্ত্রকে একই নিয়মে নাড়াচাড়া করতে ও ব্যবহার করতে হবে, তাহলে তা খুবই অসঙ্গত কাজ হত। ওর থেকে কিন্তু এমন বোঝায় না যে তাঁর স্নেহ প্রীতির মাত্রা একজনের চেয়ে আর একজনের উপর কিছু বেশি আছে, কিংবা তিনি সাধকের মধ্যে যে ভাবে তাঁর স্পর্শদান করেন তাতে ছোট-বড় কোন তারতম্য আছে। সাধকরা যে এই রকমই মনে করে থাকে, তার কারণ তারা নিজেরাই রয়েছে তাদের নিজেদের অহং ও অজ্ঞানতায় পরিপূর্ণ। মা কার উপর বেশি প্রসন্ন বা কার উপর কম, এই চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত না থেকে কিংবা কখন কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করছেন সেদিকে অনবরত লক্ষ্য না রেখে কিংবা তাই নিয়ে কোন তুলনা করতে না গিয়ে প্রত্যেকের পক্ষে উচিত যাতে প্রণামের সময় মায়ের শক্তি ও প্রভাবটিকে নিজের নিজের তরফ থেকে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হওয়া যায় তাই নিয়ে নিযুক্ত থাকা।প্রণামের ব্যবস্থাটির আসল উদ্দেশ্যই তাই, ঐ সকল জল্পনা ও বিচার তার উদ্দেশ্য নয়, আর সাধনার ক্ষেত্রে ওর কোন সার্থকতা নেই।

ঈর্ষা ও হিংসা মানব প্রকৃতির অতি সাধারণ কথা, আধ্যাত্মিক সাধকের পক্ষে এই জিনিসগুলিকে আগে দূর করে দেওয়া দরকার। নতুবা তার সাধক হওয়া কেন? এখানে সে এসেছে ভগবানকে খুঁজতে-- সুতরাং তার মধ্যে এই সব হিংসা, ঈর্ষা, ক্রোধ প্রভৃতি জিনিসের থাকবার

"একদিনেই নিজের প্রকৃতিকে বদলানো যায় না। কিন্তু ধৈর্য্য ধরে দৃঢ়সংকল্পের সঙ্গে লেগে থাকলে এ-বিষয়ে সাফল্য নিশ্চয়ই মিলবে। "--শ্রীমা

কোন আর অধিকার নেই।এগুলি সবই অহং-এর বৃত্তি, ভগবানের সঙ্গে মিলবার পক্ষে এগুলির দ্বারা কেবল বাধাই জন্মাবে।

কেবল ভগবানকে আমি চাই, এই কথাটাই সদাসর্বদা স্মরণ করতে থাকা উচিত, আর সব কিছু মূলগত চিন্তা ও লক্ষ্য অনবরত সেই দিকেই নিযুক্ত হয়ে থাকা উচিত। মাকে এতেই যতটা খুশি করা যেতে পারবে ততটা আর কিছুতে নয়, এই সব হিংসা ও ঈর্ষাও তাঁর কাছ থেকে অনুগ্রহ পাবার জন্য পরস্পরের মধ্যে রেষারেষি, এতে তিনি অস্বস্তি বোধ করেন এবং এতে তাঁকে যথেষ্ট পীড়া দেয়। (৩০-১০-১৯৩৫)

মা ভগবৎ-কৃপার প্রতিমূর্তি

প্রশ্ন ঃ বিশ্বশক্তিরূপে জগন্মাতা নিয়মিত জাগতিক বিধান অনুসারেই তাঁর কাজ করে যান, কিন্তু এই পার্থিব দেহে দেখা যাচ্ছে তিনি সর্বদাই হয়ে আছেন মূর্তিময়ী করুণা, এর কারণ কি?

উত্তর ঃ বিশ্বশক্তির কাজই হল বিশ্বকে যথা নিয়মে চালানো এবং বিশ্বের বিধানগুলি বজায় রাখা। কিন্তু বৃহত্তর রূপান্তর আসে এবং উপরকার বিশ্বাতীত সত্তা থেকে, সেই বিশ্বাতীতের বিশেষ ভগবৎ-কৃপা যাতে এখানে ফলবান হয় সেই উদ্দেশ্যেই মায়ের দেহধারণ। (১৩-৯-১৯৩৩)

স্থূলভাবে মায়ের কাছে আসার ফল কি?

সশরীরে মায়ের কাছে আসাতে এই লাভ আছে --- এতে তোমার দেহধারী মন ও প্রাণ মায়ের দেহধারী শক্তির সমুখে এসে দাঁড়াতে পারে। বিশ্বব্যাপী ক্রিয়ার ক্ষেত্রে মা তাঁর কাজ করে চলেন বস্তু-রাজ্যের স্বাভাবিক নিয়মে, কিন্তু দেহী মা হয়ে যখন তিনি কাজ করেন তখনই আসে তাঁর অফুরন্ত কৃপাদানের সরাসরি সুযোগ। আর এই কারণে তাঁর দেহধারণ। (১২-৮-১৯৩৩)

মা দেহধারণ করলেন কেন?

প্রশ্ন ঃ আমার মনে হয়, ব্যক্তিরূপেও মা সকল দিব্য-শক্তির আধার। তিনি ভগবৎ-কৃপাকে এখানকার এই জড় জগতের স্তরে উত্তরোত্তর নামিয়ে আনছেন, আর সমগ্র জড় জগৎ যাতে এবার পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হতে পারে তার একটা সুযোগ দেবার জন্যই তাঁর এই দেহধারণ এ কথা কি ঠিক?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। পার্থিব চেতনা যাতে অতিমানস চেতনাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে, আর সেই কারণে প্রথমেই যে রূপান্তর আসার প্রয়োজন হয়, দেহধারণ করে মা তারই সুযোগ এনে দিয়েছেন। পরে স্বয়ং অতিমানসই এর আরো রূপান্তর ঘটাবে। কিন্তু সমগ্র জগৎ-চেতনাই যে অতিমানস চেতনাতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে এমন নয়, আগে জন্ম নেবে এক নূতনতর জাতি যা হবে অতি মানসের পরিচায়ক, যেমন প্রাণীর জগতের মানুষ হয়েছে মনের পরিচায়ক । (১৩-৮-১৯৩৩)

এখানে মায়ের অবতরণের উদ্দেশ্য কি?

মা নেমে এসেছেন এখানে অতিমানসকে নামিয়ে আনতে, এবং তাঁর এই অবতরণের দ্বারাই সেই অতিমানসের এখানে পূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা হয়েছে। (২৩-৯-১৯৪৫)

মা আদ্যশক্তি স্বরূপা

দিব্যশক্তি একই জিনিস। তা বিশ্বের মধ্যেও ক্রিয়া করে এবং ব্যক্তির মধ্যেও ক্রিয়া করে। আবার বিশ্বকে ও ব্যক্তিকে অতিক্রম করেও তা রয়েছে। মা একাধারে এ-সবই , কিন্তু এখানে তিনি তাঁর এক বিশেষ কাজে দেহধারণ করেছেন। যাতে এখানে এমন এক জিনিস নামিয়ে আনা যায় যা ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি, যার কাজ হবে এখানকার জীবনকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করে দেওয়া। এই উদ্দেশ্য নিয়ে অবতীর্ণা স্বয়ং আদ্যাশক্তি বলেই তুমি তাঁকে জেনে রেখো। দেহধারে ইনি তাই বটে, কিন্তু তবু সমগ্র চেতনাতে ভগবানের অন্যান্য সকল স্বরূপের সঙ্গে তিনি এক হয়ে আছেন।

মায়ের সর্বব্যাপী স্থিতি

প্রশ্ন ঃ আপনি বলেছেন, ‘‘সর্বদা এই কথা স্মরণে রেখে চলবে যেন মা তোমার সব কিছুই দেখতে পাচ্ছেন, কারণ প্রকৃতই তিনি সর্বক্ষণ তোমার কাছে কাছে আছেন।”-- তাহলে তিনি সর্বদা আমাদের সকল রকম তুচ্ছতম চিন্তাগুলির সম্বন্ধেও জানতে পারেন, না কেবল যখন

‘‘চারদিকে যখন দেখছ যে বিশ্বাসঘাতকতার তুফান বইছে, তখনই তোমার নিজের দিক থেকে অটলরূপে বিশ্বাসভাজন থাকার উপযুক্ত সময়।”--শ্রীমা

মনকে সংহত করেন তখনই শুধু জানেন?

উত্তর ঃ এই কথা বলা হয়েছে , মা সর্বক্ষণই উপস্থিত থাকেন আর তোমাদের দিকে চেয়ে থাকেন। তার মানে এই নয় যে তিনি তাঁর স্থূল মন নিয়ে সর্বক্ষণ কেবল তোমাদের চিন্তাগুলিকেও লক্ষ্য করছেন।এর কোন প্রয়োজন হয় না, কারণ তিনি আছেন সর্বত্রই আর তাঁর বিশ্বব্যাপী জ্ঞান দিয়ে সর্বক্ষণ সর্বত্র প্রয়োজনীয় ক্রিয়াগুলি করে চলেছেন। (১২-৮-১৯৩১)

(২)

প্রশ্ন ঃ মা যে সর্বত্রই রয়েছেন এ কথার অর্থ কি--এই স্থূল বাস্তবের স্তরে যেখানে যা ঘটছে তাও কি তিনি জানতে পারছেন?

উত্তর ঃ অর্থাৎ এমনকি লয়েড জর্জ আজ প্রাতরাশে বসে কি কি খাবার খেলেন, বা রুজভেল্ট তাঁর চাকরদের সম্বন্ধে নিজের স্ত্রীকে কোন কথাটি বললেন, তাও পর্যন্ত? বাস্তবের স্তরে এমন সব কত কি ঘটছে সে কথা মানুষীভাবে মায়ের 'জানবার' কি দরকার আছে? তাঁর দেহধারণ করবার আসল উদ্দেশ্য হল বিশ্বগত শক্তিসমূহের বর্তমান ক্রিয়াগুলিকে জেনে তাকে তাঁর নিজের প্রয়োজনে প্রয়োগ করা, এছাড়া আর যা কিছু জানা দরকার তাও কখনো-বা তাঁর অন্তরাত্মা দিয়ে আবার কখনো-বা স্থূল মন দিয়ে তিনি জেনে নেন। তাঁর সর্বব্যাপী সত্তার মধ্যে সকল জ্ঞানই অধিগত, কিন্তু নিজের কাজের প্রয়োজনে যখন যেটির দরকার হয় কেবল সেটিকেই তিনি ব্যবহার করেন ।(১৩-৮-১৯৩৩)

মায়ের বহু রুপ ও ব্যক্তিত্ব

মায়ের কেবল এক রুপই নয়, বিভিন্ন সময়ে তাঁর বিভিন্ন মূর্তি স্থূল দেহাধারটির অন্তরালে রয়েছে মায়ের বহু আকৃতি, বহু শক্তি, বহু ব্যক্তিত্ব। (১৪-৫-১৯৩৩)

শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের চেতনার অভেদত্ব

মায়ের চেতনা ও আমার চেতনা একই, দ্বিধাভিন্ন হলেও একই দিব্য চৈতন্য,কারণ জগৎলীলার জন্য এইরকমই হওয়া দরকার। মায়ের জ্ঞান ও শক্তি ছাড়া, তাঁর চেতনা ছাড়া কোন কাজই হতে পারে না। তাঁর চেতনা যদি কেউ বাস্তবিকই অনুভব করতে পারে তাহলে সে দেখতে পাবে যে আমিও আছি তার পিছনে, তেমনি আমাকেও কেউ যদি অনুভব করে তাহলে সে দেখবে তার পিছনেও আছেন তিনি।

নিম্ন চেতনাতে মায়ের অবতরণ

গোড়া থেকেই এই দেহে যদি আমরা দুজনে অতি-মানসের স্তরে থেকে যেতাম তাহলে কেউই আমাদের কাছে পৌঁছাতে পারত না। আর এই সাধনাও তাহলে করা যেত না। আমাদের সঙ্গে এই পৃথিবীর ও পৃথিবীর মানুষদের কোনরকম সংস্পর্শই তাহলে সম্ভব হত না। এখনকার যেমন অবস্থা , তাতেও মা সকল সময়ে তাঁর আপন চেতনার মধ্যে থাকতে পারেন না, সাধকের নিম্ন চেতনাতে তাঁকে বারে বারে নেমে আসতে হয়। নচেৎ অমনি তারা জনে জনে বলতে শুরু করে ''কত দূরে সরে আছ মা তুমি, আমার প্রতি এতই নির্মম, আমাকে একটু ভালবাসো না, কোন সুবিধা তোমার কাছে মেলে না'', ইত্যাদি ইত্যাদি। মানুষের আয়ত্তের মধ্যে আসতে গেলে ভগবানকেও মানুষেরই আবরণ নিয়ে আসতে হয়।

(২)

তুমি যদি ভাব যে মা তোমাকে কোনই সাহায্য দিতে পারবেন না---তাঁর সাহায্যে যদি কোনই উপকার পাবে না বলে মনে কর, তাহলে আমার সাহায্য তোমার পক্ষে তার চেয়েও কম মিলবে। কিন্তু সে যাই হোক, শিষ্য নির্বিশেষে সকলের জন্যই আমার এই নিয়ম যে আলো এবং শক্তি সকলকে মায়ের কাছ থেকেই গ্রহণ করতে হবে, সরাসারিভাবে আমার কাছ থেকে নয়,আর আধ্যাত্মিক প্রয়াসের পথের সকলকে মায়ের দ্বারাই চালিত হতে হবে। এনিয়মের আমি কোন ব্যতিক্রম করতে চাই না। কোন সাময়িক উদ্দেশ্যে আমি এমন ব্যবস্থা করিনি, করেছি এই কারণে যে এইরকমই হল একমাত্র উপায়-- অবশ্য শিষ্য যদি নিজেকে সমুচিতভাবে উন্মীলন করে দিতে পারে, (মা যে কি এবং তাঁর শক্তিই-বা কি একথা স্মরণ রেখে) যদি সে ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারে যা সত্য যা ফলপ্রদ, তবেই।

অনুবাদ ঃ পশুপতি ভট্টাচার্য (Letters of Sri Aurobindo on the Mother) পুস্তক থেকে অনুবাদ)

''আমাদের বোধশক্তির অক্ষমতাই আবিষ্কার করেছে অন্ধকার। সত্যই আলো ছাড়া আর কিছুই নেই। শুধু সে-আলোকশক্তি বেচারা মানুষী দৃষ্টিশক্তির উপরে বা নিচে। -----শ্রীঅরবিন্দ।

''ভালো যে বাসতে জানে সে-ই ভালোবাসা চিনতে জানে। ঐকান্তিক ভালোবাসায় যারা নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারে না, তারা কোনোখানেই ভালোবাসাকে দেখতে পায় না। ভালোবাসা যতই নিঃস্বার্থ অর্থাৎ দিব্য ভাবের হবে, ততই সে ভালোবাসাকে চেনা তাদের পক্ষে দুরুহ হয়ে উঠবে।''--শ্রীমা

নির্ভাবনায় বাঁচতে হলে

শ্রীমা

এটা বেশ স্পষ্ট যে মনের ক্ষমতাই মানুষকে বিশেষ স্বতন্ত্র জীব হিসেবে চিহ্নিত করেছে, এরই বলে মানুষ নিজের দিকে ফিরে তাকাতে পারে। পশু বাঁচে সহজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে, যদিও বা সে নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়, তবে তা অতি সামান্য ও নগণ্য মাত্রায়,আর এইজন্যই পশুর জীবন এতশান্তিময়, নিজেকে ওরা দুর্ভাবনায় পীড়িত করে না। এমনকি কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে বা অসুখে পড়লেও পশু খুবই কম যন্ত্রণা ভোগ করে, কেননা নিজের যন্ত্রণার দিকে লক্ষ্যই করে না সে, ভবিষ্যতের দিকে বা নিজের চেতনার দিকে কষ্টটাকে টেনে আনার অভ্যাসও তার নেই। পশুরা, নিজেদের অসুখবিসুখ বা কোনো দুর্ঘটনা নিয়ে চিন্তাই করে না।

''কি হবে?'' ''কি হবে?''--এই সদাসক্রিয় দুশ্চিন্তাটি শুরু হল মানুষের সঙ্গে সঙ্গে, আর এই দুর্ভাবনাই আর সকল যন্ত্রণার মূল কারণ। চেতনাকে বাহ্যবিষয়ীভূত করায় আরম্ভ হল যত দুশ্চিন্তা, কষ্টকর কল্পনা, সন্ত্রস্ততা, বেদনা আর ভাবী বিপদের আশঙ্কা। এইজন্যে যারা সবচেয়ে সচেতন, যারা সবচেয়ে কম চেতনাসম্পন্ন তারা নয়, মানবজাতির এই বৃহত্তর অংশটি চিরকাল কষ্টই ভোগ করে। মানুষ এত সচেতন যে তার পক্ষে উদাসীন থাকা অসম্ভব, আবার তার চেতনা এত কম যে ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা বোঝাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। পৃথিবীর সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষই যে সবচেয়ে দুঃখী, এটা একেবারে অভ্রান্ত সত্য। এইভাবে বাঁচতেই মানুষ অভ্যস্ত, কেননা এই অচেতনার অবস্থাটি সে তার পাশবিক ঐতিহ্য থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। কিন্তু সত্যি এ হল মর্মান্তিক অবস্থা।একমাত্র আত্মিক ক্ষমতার সাহায্যেই মানুষ এক উচ্চতর স্তরে উন্নীত হতে পারে, পাশবিক অচেতনাকে দূর করে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এমন এক মহৎ আধ্যাত্মিক চেতনা যার বলে সে যে শুধু জীবনের উদ্দেশ্যই বুঝতে পারবে ও নিজের সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতিটি জানতে পারবে তা নয়, পরন্তু অপর এক উচ্চতর আধ্যাত্মিক শক্তির উপরে সরল বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে সে , যে শক্তির কাছে পরম নির্ভরতার সঙ্গে নিজেকে দিয়ে দেওয়া যায়, আপন জীবন ও ভবিষ্যৎকে সমপর্ণ করা যায় এবং এইভাবে সকল দুশ্চিন্তাও ত্যাগ করা যায়।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে মানুষের পক্ষে আবার পশু স্তরে নেমে আসা অথবা যে চেতনা সে লাভ করেছে সেই চেতনা হারান অসম্ভব সুতরাং আমি যে দূরবস্থার কথা বলছি এবং বর্তমানে মানুষ যে দূরবস্থায় আছে, তা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে কিংবা দুশ্চিন্তার বদলে সরল সহজ ও মহান পূর্ণতার নিশ্চিত আশ্বাস রয়েছে এমন একটি উচ্চতর অবস্থায় পৌছতে হলে একটিমাত্র উপায়ই আছে এই উপায়টি হল নিজের চেতনার পরিবর্তন সাধন।

যার চাবিকাঠিটি হাতে নেই, অর্থাৎ সমস্যার সমাধানে এগিয়ে দেবার উপযোগী সূত্রের অভাব রয়েছে যার এমন একটি জীবনের দায়িত্ব বহন করার চেয়ে মর্মান্তিক অবস্থা সত্যি আর কিছু নেই। পশুর সামনে কোনও সমস্যা নেই, সে জীবন ধারণ করে মাত্র। পশুর প্রবৃত্তি পশুকে চালিত করে, সে নির্ভর করে সমষ্টির চেতনার 'পরে-- যার মধ্যে আছে অপেক্ষাকৃত বেশি সহজ বোধশক্তি। ওদের ওই সব ব্যাপারই স্বতঃস্ফূর্ত। স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক হবার জন্য পশুকে চেষ্টা করতে হয়নি, আপনা থেকেই ওরা এরকম হয়েছে। পশু তার জীবনের জন্যে দায়িত্ব বোধ করে না, সেই জন্যে

''ধ্যানের সহায়ে মন যে শান্ত হয় তা স্থায়ী নয়। কারণ যেই তোমার ধ্যান ভেঙ্গে যায় সঙ্গে সঙ্গে শান্তিও ভেঙ্গে যায়। মন, প্রাণ, শরীর পর্যন্ত সত্যত স্থায়ীভাবে স্থির হয়ে যায় ভগবানের কাছে পূর্ণ উৎসর্গের ফলে। কারণ যখন তোমার নিজের বলতে কিছু থাকে না, নিজে পর্যন্ত নয়, যখন তোমার সব , শরীর, ইন্দ্রিয়ানুভাব, হৃদয়াবেগ, চিন্তা সবই ভগবানের হয়ে যায় তখন ভগবান তোমার সব ভার গ্রহণ করেন, তখন তোমার দুর্ভাবনা কিছু থাকে না। ---শ্রীমা।

ওদের দুশ্চিন্তাও নেই। মানুষের আসার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ববোধের সৃষ্টি হল--নিজের 'পরে নির্ভর করে চলায় নানা ভাবনা পেয়ে বসল তাকে, অথচ প্রয়োজনীয় জ্ঞান তার লাভ হয়নি, ফলে দাঁড়াল অন্তহীন যন্ত্রণা। মানুষী চেতনার চেয়ে এক উচ্চতর চেতনা , যাকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করা যায়, নিজের সমস্ত দুশ্চিন্তা ও জীবনের সমস্ত দায়িত্ব তুলে দেওয়া যায় যার হাতে, এমনি একটি চেতনার কাছে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করা ছাড়া যন্ত্রণার নির্বাণের আর কোনো উপায় নেই।

সমাধান করার উপযোগী জ্ঞান যদি তোমার না থাকে, তুমি কেমন করে একটা সমস্যার সমাধান করবে? দুর্ভাগ্যের বিষয় হল এই যে মানুষ ভাবে তাকেই তার জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে হবে, অথচ সমাধানের জন্যে যা দরকার এমন জ্ঞান তার নেই। এই হল সকল দুঃখের মূল উৎস। মানুষের চিরকালের প্রশ্ন হল 'কি করা যাবে?' তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর একটি কঠিনতর প্রশ্ন ঃ ' কি হবে', এর উত্তর দানের কমবেশী অক্ষমতাও চিরন্তন ব্যাপার।

সেইজন্যে সকল আধ্যাত্মিক নিয়মানুবর্তিতার শুরুই হয়েছে সর্বপ্রকার দায়িত্ব-বর্জন ও মহত্তর শক্তির কাছে আত্ম সমর্পণ দিয়ে, নইলে শান্তি লাভ অসম্ভব হয়ে ওঠে।

তবুও প্রগতির জন্যে, অজানাকে আবিষ্কার করার জন্যে এবং মানুষ যা এখনো হয়ে ওঠেনি, তাই যাতে সে হয়ে উঠতে পারে,সেইজন্য তাকে চেতনা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে নিশ্চল নির্বিকল্প শান্তির চেয়ে একটা মহত্তর অবস্থা রয়েছে। আর এ হল এমন এক সর্বব্যাপী আশ্বাস, যার বলে মানুষ তার এগিয়ে চলার আস্পৃহাকে নিয়ত-জাগ্রত রাখতে পারে, রাখতে পারে সকল দুশ্চিন্তা ও ফলাকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত। এ হল 'শান্তিবাদী' পন্থাগুলির তুলনায় একধাপ এগিয়ে চলা। শান্তিবাদী পন্থাগুলির ভিত্তি হল সর্বপ্রকার কর্মবর্জন, নিজের মধ্যে সমাহিত হয়ে থাকা এবং জীবনের সংস্রবশূন্য একটি আন্তর নীববতা লাভ, কেননা শান্তি ব্যতীত কোনো আন্তর উপলব্ধি সম্ভব নয়. তোমরা তো একথা একটু আগেই শুনেছ। আর একথা খুবই ঠিক যে যতদিন কোন লোক বাইরের ঘটনার 'পরে নির্ভর করে জীবন কাটাবে ততদিন তার পক্ষে শান্তিলাভ অসম্ভব। বাইরের নিয়ন্ত্রণে থাকলেই মানুষকে দুশ্চিন্তায় থাকতে হবে, কেননা, যেসব সমস্যা তার সামনে আসে তার সমাধান সে করতে পারে না, কেমন করে সমাধান করতে হবে সে-জ্ঞানেরই তার অভাব।

এর পরের ধাপ হল ভগবান, যিনি তোমায় জানেন ও তোমাকে দিয়ে কাজও করাতে পারেন, তাঁর পূর্ণ নির্ভরতা থেকে যে শান্তি ও বিজয় সম্পর্কে নিশ্চয়তাবোধ আসে, সেই শান্তি ও নিশ্চয়তা বোধ নিয়ে সমস্যার মুখোমুখি হওয়া। তাহলে আর কর্মত্যাগের প্রয়োজন হবে না, বরং এক দৃঢ়, সক্রিয় ও উচ্চতর শান্তি নিয়ে তুমি কাজ করে যেতে পারবে।

ভগবান যে মানবজীবনে হস্তক্ষেপ করেন এ হল তার এক নতুন দিক। আজকের দিব্য-শক্তি সমূহের এক নতুন রুপ হল এই সক্রিয় শক্তি এ এক নবতর আধ্যাত্মিক সিদ্ধি।

অনুবাদ ঃ তীর্থনাথ সরকার। (শ্রীমার ' To Live Without Torments 'এর ভাবানুবাদ।

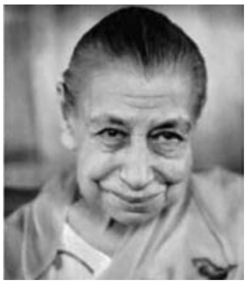

"ভগবানের কাছে শুধু কৃপাই চাও-- যদি বিচার চাও তাহলে ভুল করবে, কারণ খুব কম লোকই তাঁর বিচারের সম্মুখীন হতে পারবে।"--শ্রীমা

ভগবান বলি কাকে ?

শ্রীমা

২৪শে মে ১৯৬৭

গতকাল আমার কাছে একজন প্রশ্ন লিখে পাঠিয়েছে। ভগবান কি?

আমি তার জবাব দিয়েছি। বলেছি, তোমাকে সাহায্য করার জন্য একটা জবাব আমি দিচ্ছি, কিন্তু এর জবাব হতে পারে শতাধিক যার প্রত্যেকটাই অপরটির সমান সত্য।

''ভগবানকে জীবনে ধারণ করতে হয় কিন্তু বলে বোঝানো যায়না।''

তারপরে আরো বলেছি, কিন্তু তুমি যখন জিজ্ঞাসা করছ, তখন বলি ঃ

''ভগবান হলেন পরিপূর্ণ পূর্ণতা। /সকল অস্তিত্বের অনন্ত উৎস। /তাঁর সম্বন্ধে আমরা ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠি,/তাঁতেই পরিণত হয়ে চলি অনন্ত কাল ধরে।''

একবার আমাকে কেউ একজন বলেছিল, ভগবান তার পক্ষে চিন্তার অতীত। আমি তাকে বললাম, না, ওভাবে চিন্তা করেকোন লাভ নেই, তোমাকে শুধু ভাবতে হবে, ভগবান হলেন সব -- আমরা যা কিছু হতে চাই সবই তিনি। এতে সে খুব খুশি হয়ে বলেছিল, ''ও, এভাবে? এবারতো বেশ সহজ হয়েছে। ''

যখন নিজের দিকে তাকাও (মনের ক্রিয়া থেকে বেরিয়ে এসে যেমন তোমার অভিজ্ঞতার দিকে তাকাওসে রকম),আর মনে মনে বল, ''কেমন ক'রে বলা যায়,কেমন করে বোঝান যায়'',তখন দেখবে এমন ''কিছু একটা''আছে যার জন্য আমরা আকুল হই, স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে যা আমরা হতে চাই, যা কিছু আমরা সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বলে ধারণা করতে পারি, আমাদের তীব্র (তীব্র এবং অজ্ঞান) আস্পৃহার যা লক্ষ্য, সেই ''কিছু একটাই'তোমার সবচেয়ে নিকটের, সবচেয়ে অন্তরের জিনিস, তাই সবচেয়ে সহজে অধিগম্য। এভাবেই সেই ''কিছু একটার'' নিকটবর্তী হও--মূলত চিন্তার সাহায্যে তার সঙ্গে তোমার সংযোগ হয় না, সংযোগ হয় এমন কিছুর মাধ্যমে যা তোমার সত্তার সঙ্গে একাত্ম-- আস্পৃহার তীব্রতায় তা জেগে ওঠে। যখনই তার সঙ্গে তোমার সংযোগ হয়, মিলন হয়, এক পলকের জন্য হলেও, তখন আর ব্যাখার প্রয়োজন হয় না। এ এমন জিনিস যা অনিবার্যভাবে এসে আসন পাতে -- সকল ব্যাখা ও বোঝাবুঝির উর্ধ্বে।

কিন্তু সেখানে পৌঁছবার জন্য প্রত্যেকেই চলে অন্তরের সহজতম নির্দেশে।

মিলনের, একাত্মতার উপলব্ধি হলে সেই মুহূর্তেই চেতনায় এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তার সঙ্গে অভিন্ন সেই অভিন্নকে চিনতে পারে।সে যে রয়েছে (মা হৃদকেন্দ্রে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন) এই হল তার প্রমান। তীব্র আস্পৃহার দ্বারা তা জেগে ওঠে।

এই প্রশ্নটি পেতে আমার মনে হয়েছিল যেন সে ব্যক্তি বলছে,''হ্যাঁ হ্যাঁ সবই তো ঠিক আছে কিন্তু তবুও , সব ধরেও আমরা যাকে ভগবান বলি সেটা কি জিনিস?''তখন তার চিঠিটা আমি পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা নীরবতা নেমে এল, সর্বাঙ্গীন নীরবতা, সব কিছুর -- আর একটা দৃষ্টি যা সব কিছুকে একসঙ্গে এক দৃষ্টিতে দেখে নিতে চায়। সেই দৃষ্টিতে আমি তাকিয়ে রইলাম যতক্ষন না এই কথাগুলি এল আমি লিখলাম। ''জবাব একটা দিচ্ছি কিন্তু এর জবাব হতে পারে শতবিধ, প্রত্যেকটাই অপরটার সমান সত্য''।

যখন আমি তাকিয়ে ছিলাম ''কিছু একটার '' দিকে আর একটা সংজ্ঞার প্রয়োজন ছিল,তখন আস্পৃহা (মা হাত দিয়ে দেখালেন একটা শিখা যেন উপরের দিকে উঠেছে)--আর তার যাবতীয় রূপ--যতরকম রূপ তা গ্রহণ করেছিল। ব্যাপারটা খুব চিত্তকর্ষক-- এ হল পৃথিবীর আস্পৃহার ইতিবৃত্ত-- সেই পরমাশ্চর্য অজানার দিক-- যা লোকে হতে চায়।

আর যাদেরই সেই মহা অজানার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সৌভাগ্য নির্দিষ্ট ছিল তারা প্রত্যেকেই সরল মনে বিশ্বাস করেছে তার অনুসৃত পথই একমাত্র পথ। তারই ফলে সৃষ্টি হয়েছে যত ধর্ম, দর্শন, নীতি, বিশ্বাস আর হানাহানি।

ব্যাপারটাকে সমগ্রভাবে দেখলে খুবই চিত্তাকর্ষক মনে হয়। ভারী চমৎকার জিনিস। একটু হাসির সঙ্গে যদি দেখ-- একটুখানি হাসি যার

''মনের সংকীর্ণতা ও হৃদয়ের দুর্বলতা থাকলেই তার থেকে ঈর্ষা এসে পড়ে। জগতে এত লোকের মধ্যে যে ঈর্ষা জন্মায় এটা খুবই দুঃখের কথা।''--শ্রীমা

অর্থ হল তোমরা সব কিছুকেই কেবল জটিল করে তোল, অথচ ব্যাপারটা কত সরল। সাহিত্যের ভঙ্গীতে বলা যায়, ‘এত জটিলতা একটা সরল জিনিসের জন্য, আত্মস্বরুপ হয়ে ওঠা। ”

(মা একটু নীরব থেকে বললেন)

তুমি কী মনে কর? ভগবান কী?

--জানি না, নিজেকে কখনও এ প্রশ্ন করিনি।

-- আমিও না। কখনও এ প্রশ্ন করি না আমি।

কারণ যখনই জানার প্রয়োজন হত তখনই আপনা থেকে তার জবাব পেয়ে যেতাম। সে জবাব একটা স্পন্দনের মত কিছু কথা নয় যা লোকে আলোচনা করে। সেই স্পন্দন এখন সব সময়ই রয়েছে।

স্বভাবতই মানুষ বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করে (আমি মনে করি তারা ওগুলিকে পছন্দ করে) কারণ---কারণ---সব কিছুতেই, একটা সামান্য ব্যাপারেও, সব সময়েই রয়েছে একটা বাধাবিঘ্নের জগৎ। তাই শান্তি শান্তি-- শান্তি -- এই জপ করতে করতেই লোকের সময় কেটে যায়। তারপর শরীরও রয়েছে বাধাবিঘ্নের মধ্যে (সেও মনে হয় ওগুলিকে পছন্দ করে)। কিন্তু হঠাৎ এক দিন শরীরের কোষগুলি গেয়ে ওঠে তাদের ওঁ স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তারপর এই সমস্ত কোষগুলির মধ্যে একটা শিশুর উল্লাস যেন বলে ওঠে,‘‘ও! হ্যাঁ! এ জিনিস করা যায়! এ করবার আমাদের অধিকার আছে। ” এ খুবই হৃদয়স্পর্শী।

তার ফলও পাওয়া যায় সঙ্গে সঙ্গেই --সেই শান্তিময় সর্বশক্তিমান মহান স্পন্দন।

আমার বেলায়, আমি যদি চারিদিকের যত ইচ্ছার নিরন্তর একটা চাপের মধ্যে না থাকতাম তবে বলতাম, ‘‘ভগবান কী তা জানতে চাও কেন? তা জেনে তোমার কি হবে? তোমার কাজতো শুধু ভগবান হয়ে ওঠা।” কিন্তু লোকে কৌতুক বোঝে না।

--আমি জানতে চাই ভগবান কী?

---কিন্তু না, তা একেবারেই নিরর্থক।

--ও।

একটা বক্রদৃষ্টি হেনে তারা বলবে, ও! জানাটা মজার ব্যাপার নয় কি?

---জানার দরকার নেই কিছু, দরকার হয়ে ওঠার!

এরা, অর্থাৎ এই বিরাট বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অধিকাংশই, ধারণাই করতে পারে না যে কী জিনিস কোন কিছু না জেনে তা করা যায় বা হওয়া যায়।

কৌতুক করে বলা যায়, যখন কিছুই জান না তখনই তোমার সবচেয়ে বেশী দিব্য অবস্থা।

যারা কতকগুলি সূত্র নিয়ে থাকতে ভালোবাসে তাদের জন্য ‘‘ভগবান কী” এ প্রশ্নের অন্যরকম একটি উত্তর আছে ঃ হাস্যময় জ্যোতির্ময় এক বিশালতা---

যা নিত্যস্থিত , যা সদা বিরাজমান।

(কয়েকদিন পরে মা আবার এ প্রসঙ্গে বলেন)

সেদিন ভগবান সম্বন্ধে যা বলেছি তার সঙ্গে আরো কিছু আমি যোগ করতে চাই। একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে!

---তাহলে ভগবান কী?

শ্রীঅরবিন্দের একটি লেখায় রয়েছে ঃ

‘‘প্রেম আমাদের অনৈক্যের দুর্ভোগ থেকে পূর্ণ মিলনের আনন্দের মধ্যে নিয়ে যায়, কিন্তু তা মিলনের সক্রিয় আনন্দকে হারায় না। এ হল আত্মার সর্বোত্তম আবিষ্কার। পার্থিব জীবন হল তার দীর্ঘ প্রস্তুতি। প্রেমের দ্বারা ভগবানেরকাছে যাওয়া হল সর্বোত্তম আধ্যাত্মিক পূর্ণতার জন্য প্রস্তুতি।”

এই শেষের কথাটি প্রসঙ্গেই জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ‘‘ভগবান (God) কী”?

“অন্যে কিছু করলে বা বললে বা মনে করলে তোমার যদি তাতে আঘাত লেগে যায়, তাতেই প্রমান হয়ে যাবে তোমার সমগ্র সত্তা তাহলে এখনো ভগবানের দিকে সম্পূর্ণ ফেরেনি, এখনো সে কেবল ভগবানের ভাবেই ভাবিত নয়।”--শ্রীমা।

(এই God শব্দটি আমি দিয়েছি) আমি বলেছিলাম ঃ

‘‘এ হল একটা নাম, মানুষ দিয়েছে সে-সবকে যা-কিছু তাকে ছাড়িয়ে রয়েছে, তার উপর প্রভুত্ব করছে, যাকে সে জানাতে পারে না, যার কাছে সে নতি স্বীকার করে।’’

এখানে‘‘সে-সবকে যা-কিছু তাকে ছাড়িয়ে রয়েছে’’ এরূপ না বলে বলা যায়, ‘তাঁকে বা তাকে ছাড়িয়ে রয়েছে।’ কেননা, ‘‘ সে-সবকে’’ কথাটাতে বুদ্ধির দিক দিয়ে দেখলে তর্ক এসে পড়ে। আমি বলেছি ‘‘কিছু একটা’’ আছে-- কিছু একটা, যা নির্দিষ্ট করা যায় না যাকে বোঝা যায় না এবং মানুষ সবসময়ই অনুভব করছে এই ‘‘কিছু একটাই’’হল সকল বোধের অতীত, যা তার উপর প্রভুত্ব করে। তারপর এক একটা ধর্ম তার দিয়েছে এক একটা নাম। মানুষ তাকে বলে ভগবান। ইংরেজরা তাকে বলে God, অন্য ভাষায় তার নাম অন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব একই।

আমি যে কোন সংজ্ঞা দিই না তার একটা উদ্দেশ্য আছে। আমার সারা জীবন ধরে এই অভিজ্ঞতা হয়েছে এ হল একটা শব্দ, এমন একটা শব্দ যার সঙ্গে মানুষ অনেক কিছু অবাঞ্ছনীয় মিশিয়ে ফেলেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভগবানের ধারণা ঃ অনেকে মনে করে ভগবান একক হয়ে থাকতে চান। তারা বলে, ভগবান এক অদ্বিতীয়। তারা এটাই অনুভব করে আর বলে, যেমন আনাতোল ফ্রাঁস বলেছিলেন (সম্ভবত তাঁর Re-volte des Anges বইতে) ঃ ‘‘এই ভগবান লোকটা চায় একমাত্র সেই অদ্বিতীয় হয়ে থাকতে। বলা যায় এটাই আমাকে ছেলেবেলায় পুরোপুরি নাস্তিক করে তুলেছে। যে নিজেকে অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান বলে ঘোষণা করে, সে যেই হোক না কেন, তাকে আমি স্বীকার করি না। সে যদি অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান হয়ও তা ঘোষণা করার কোন অধিকার নেই তার। ’’

এ রকমই মনে হয়েছিল আমার। প্রত্যেক ধর্মে এই ভাবটা কেমন করে এল তা নিয়ে আমি ঘন্টার পর ঘন্টা বলে যেতে পারি।’’

যাই হোক আমার কাছে যা সবচেয়ে বাস্তব বলে মনে হয়েছিল সেরকমই একটা সংজ্ঞা দিয়েছিলাম এবং সেদিনের মত ‘‘ভগবান কী’’ এই প্রশ্নের উত্তরে যথার্থ বস্তু সম্বন্ধে একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করেছি। এখানে আমি শব্দ ব্যবহারের বিরুদ্ধে লড়তে চেষ্টা করেছি, আমার কাছে তা ফাঁকা বলই মনে হয়, মারাত্মক রকমের ফাঁকা।

মনে পড়ছে ‘সাবিত্রী’র একটা শ্লোক, খুব শক্তিগত একটা লাইনেই এই সব কিছু আশ্চর্যভাবে বলা হয়েছে। বলছে ঃ ‘‘যিনি অনাম তিনি দেখলেন ভগবানের জন্ম হল।’’

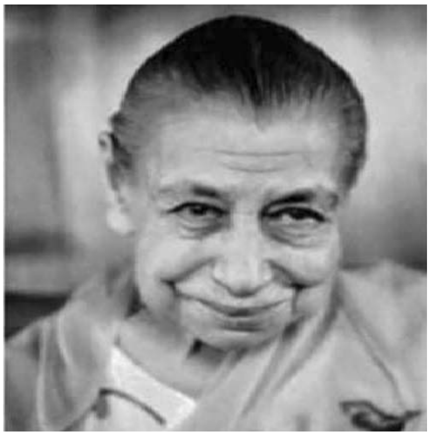

‘‘মানুষ যদি সত্যই তার চেতনার পরিবর্তন চায়,তখনই তার কাজের ধারাও বদলাতে শুরু করে।’’--শ্রীমা।

The bodiless Namelessness that
saw God born
And tries to gain from mortals mind
and soul
A deathless body and a divine name.
(Savitri , Book 1, Canto 3, p.47)
But since she knows the toil of mind and life
As a mother feels and shares her childrens lives,
She puts forth a small portion of herself ,
A being no bigger than the thumb of man
Into a hidden region of the heart
To share the suffering and endure earths wounds
And labour mid the labour of the stars .
This in us laughs and weeps,suffers the stroke ,
Exults in victory , struggles for the crown ,
Identified with the mind and body and life ,
It takes on itself their anguish and defeat,
Bleeds with Fates whips and hangs upon the cross,
Yet is the unwounded and immortal self
Supporting the actor in the human scene.
Through this she sends us her glory and her powers,
Pushes to wisdoms heights ,through miserys gulfs,
She gives us strength to do our daily task
And sympathy that partakes of others grief
And the little strength we have to help our race,
We who must fill the role of the universe
Acting itself out in a slight human shape
And on our shoulders carry the struggling world.
This is in us the godhead small and marred,
In this human portion of divinity
She seats the greatness of the Soul in Time
To uplift from light to light , from power to power ,
Till on a heavenly peak it stands ,a king.(526--27)

বর্তমান বিশ্ব-সংকটের কারণ ও গতি

শ্রীমা

একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে মানবজাতি এক সর্বব্যাপী সংকটের মধ্যে এসে পৌঁছেছে। চিন্তায় চেষ্টায় কাজেকর্মে, এমনকি দৈনন্দিন জীবনেও ছড়িয়ে পড়েছে এই সংকট। উত্তেজনা ও উন্মাদনা এত বেড়ে গেছে যে মনে হচ্ছে সমগ্র মানবজাতি এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে হয় তাকে সমস্ত বাধা কাটিয়ে একটি নতুন চেতনা লাভ করতে হবে, নয়তো জড়তা ও অন্ধকারের অতল তলিয়ে যাওয়া ছাড়া গতি নেই।

এই সংকট এত তীব্র ও সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছে যে একটা কিছুকে ভেঙে যেতেই হবে। এভাবে উত্তেজনা আর চলতে পারে না। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি প্রমান করে যে জড়ের মধ্যে একটি নতুন শক্তি ও চেতনা প্রবেশ করেছে এবং এরই চাপে এই সংকটজনক অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হতে পারে একটা কিছু পরিবর্তন আনবার ইচ্ছে হলে প্রকৃতি যেসব পুরনো উপায়গুলি ব্যবহার করে থাকে, এবারও বোধ হয় সে তাই করছে। কিন্তু এবার একটি নতুন শক্তি দেখা দিয়েছে। মাত্র কয়েকজন সচেতন ব্যক্তির কাছে এটি ধরা পড়েছে। পৃথিবীর চারধারে ছড়িয়ে আছেন তাঁরা। এই নতুন শক্তিটি কোনো গন্ডীতে বাধা নয়, পৃথিবীর কোনও একটি স্থানেও সীমাবদ্ধ নয়। জগতের সর্বত্র,সবদেশে এর লক্ষন দেখতে পাওয়া যেতে পারে। চিহ্নগুলি হল ---উচ্চতর আদর্শের আস্পৃহা, নবতর ও মহত্তর সমাধান সন্ধান এবং ব্যাপকতর ও পূর্ণতর পূর্ণতালাভের প্রয়াস।

কিছু কিছু ভাবধারা যে গড়ে উঠেছে একথা বলা যেতে পারে আর এইসব ভাবধারা পৃথিবীতে ক্রিয়া করছে। এখন দুটি জিনিস পাশাপাশি রয়েছে ঃ বৃহত্তম ও পূর্ণতম ধ্বংস --নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে সর্বনাশকর ধ্বংসের আশংকা মারাত্মকভাবে বেড়ে যাচ্ছে--- আর এই ধ্বংসলীলা পূর্বের চেয়ে অনেক ব্যাপক হবে।এরই পাশে রয়েছে আর একটি মহৎ সম্ভাবনা---উচ্চতর, ব্যাপকতর ভাবধারা ও ইচ্ছশক্তির প্রকাশ।আর এগুলিকে গ্রহণ করতে পারলে পূর্বের চেয়ে বৃহত্তর, পূর্ণতর ও বিশুদ্ধতার সমাধান সম্ভব হবে।

বিবতর্নের ঊর্ধ্বগতির শুভ শক্তিসমূহ এবং পূর্ণতর দিব্য উপলব্ধির সংগে ধ্বংসশক্তির এই সংঘাত ও সংঘর্ষ ক্রমেই বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। বিরোধী শক্তির ধ্বংসের ক্ষমতাও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে---উন্মত্ত এইসব শক্তি সকলরকম নিয়ন্ত্রনের বাইরে। এ যেন এক ধরনের দৌড়ের প্রতিযোগিতা চলেছে --লক্ষ্যস্থলে কে আগে পৌঁছতে পারে, ভগবৎশক্তি না, ভগবৎবিরেধী শক্তি। মনে হচ্ছে যে ভগবৎবিরোধী অপশক্তিসব,প্রাণিক জগতের শক্তিসমূহ নেমে এসেছে, পৃথিবীই এখন তাদের কর্মক্ষেত্র।আবার ওই একই সঙ্গে, পৃথিবীতে নতুন জীবন সৃষ্টি করার জন্যে, এই প্রথম, উচ্চতম এবং প্রবলতম এক আধ্যাত্মিক শক্তি অবতীর্ণ হয়েছে এখানে। এইজন্যে সংঘাত আরও তীব্র প্রচন্ড এবং স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তথাপি এই সংঘাতের একটা নির্দিষ্ট ফল পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। আর সেই কারণেই একটা আশু সমাধানের আশাও হচ্ছে।

খুব বেশি দিনের কথা নয়, এমন এক সময় ছিল যখন জাগতিক সকল বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন, স্তব্ধ নিষ্ক্রিয় এক শক্তিই ছিল মানুষের আধ্যাত্মিক অভীপ্সার লক্ষ্য। সংগ্রামকে এড়িয়ে গিয়ে কিংবা সংগ্রামের উর্দ্ধে উঠে সকলরকম চেষ্টা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে জীবনকে বর্জন করাই ছিল এই শক্তির স্বরুপ। এ এমনি এক আধ্যাত্মিক শক্তি যেখানে সকলরকম উত্তেজনা, সংঘাত ও সংগ্রামের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রকার যন্ত্রনারও নির্বানঘটত। আধ্যাত্মিক ও দিব্যজীবনের একমাত্র সত্য প্রকাশ বলতে এই শক্তির কথাই মনে হত তখন।

একেই তখন ভগবানের করুণা ও সাহায্য বলা হত। এই যে সুমহান শান্তি এবং মুক্তি লোকে যার জন্যে প্রার্থনা করে, এই শান্তি ও মুক্তি, আজ এই অতিরিক্ত যন্ত্রণা ও উত্তেজনার যুগেও ভগবানের দেওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ বর, আরসেই জন্যেই সবচেয়ে গ্রহনীয়। অনেকের ক্ষেত্রে এই শক্তিই ভগবানের করুণার অভ্রান্ত চিহ্ন।

সত্যি, যা কিছু তুমি উপলব্ধি করতে চাও না কেন, আধারের মধ্যে এই নিটোল নির্বচল শান্তি প্রতিষ্ঠা দিয়েই আরম্ভ করতে হবে। শান্তিই হল ভিত্তি যার উপর কোনকিছু গড়ে তুলতে পার তুমি। কিন্তু যদি তোমার শুধু ব্যক্তিগত মুক্তির কামনা না থাকে, তাহলে ওখানেই থামলে চলবে না।

ভগবানের করুণার আর একটি দিক আছে এ হল সেই প্রগতির শক্তি,সকল বাধাকে সে জয় করবে মানবজাতিকে তুলে ধরবে নতুন উপলব্ধির মধ্যে,নতুন পৃথিবীর দরজা খুলে দেবে। কয়েকজন বাছাই লোককেই শুধু দিব্য উপলব্ধি লাভের ভাগীদার করবে না, পরন্তু তাদের প্রভাব, দৃষ্টান্ত ও ক্ষমতা যাতে অবশিষ্ট মানবজাতিকে আরও ভাল অবস্থায় পৌঁছে দিতে পারে, তারও ব্যবস্থা করবে।

"পরিস্কার রকমে দেখা ও বোঝা আর সঠিক রকমে কাজ করার জন্য মাথাটি একেবারেই ঠান্ডা রাখতে হবে।"--শ্রীমা

এর ফলে, ভবিষ্যতের উপলব্ধির পথ খুলে যাচ্ছে। আগে যেসব জিনিস আশা করা গেছিল সেসব সম্ভাবনা আজ দেখা দিচ্ছে---মানবজাতির সেই সুবৃহৎ অংশ যারা সচেতন ভাবেই হোক, অচেতন ভাবেই হোক, নতুন শক্তি সমূহের দিকে নিজেদের খুলে ধরবে তারাই এক উন্নততর সংহততর ও পূর্ণতর জীবনের অধিকারী হবে। ব্যক্তিগতভাবে সবার রুপান্তর যদি সম্ভব নাও হয় এক্ষেত্রে, তথাপি একটা সাধারণ প্রগতি ও সামগ্রিক ঐক্য সাধিত হবে, যার ফলে সৃষ্টি হবে এক নতুন জাতি। বর্তমান যুগের সংঘাত ও বিশৃঙ্খলার যন্ত্রণা তিরোহিত হয়ে সর্বব্যাপারে সংহতিও স্থাপিত হবে।

কিন্তু এই নতুন শক্তির দিকে যাদের তুলে ধরা যাবে না, যারা এগোতে চাইবে না তারা আপনা-আপনি তাদের মানস চেতনার ব্যবহার হারাবে এবং মানুষের চেয়ে নীচু ধাপে নেমে যাবে।

আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি শোন, তাহলে ব্যাপারটা আরও ভালোভাবে বুঝতে সুবিধা হবে তোমাদের। ৩রা ফেব্রুয়ারির অতি মানসিক অভিজ্ঞতার কিছু পরেই,তখন আমি এমন অবস্থায় ছিলাম যে এই জড় পৃথিবীর সবকিছুই খুব দূর আর অর্থহীন মনে হচ্ছিল এই সময়কার অভিজ্ঞতা। একদল দর্শক আমাকে প্রণাম করার জন্যে সম্মতি চেয়েছিল।একদিন সন্ধ্যেবেলা তারা খেলার মাঠে এল।এরা ছিল ধনী--অর্থাৎ জীবনধারনের জন্যে যে টাকাকড়ির দরকার এদের তা ছিল তার চেয়ে বেশি পরিমানে। এই দলে একটি শাড়িপরা মেয়ে ছিল। সে অত্যন্ত মোটা আর শাড়িটা সে এমনভাবে পরেছিল যাতে তার সমস্ত দেহটি ঢাকা পড়ে যায়। আমার আশীর্বাদ নেবার জন্যে যখনসে নুয়ে পড়ল তখন শাড়ির একটি দিক খুলে যাওয়ায় তার বিরাট উদরটা অনাবৃত হয়ে পড়ল। এই দৃশ্যে আমি আহত হলাম। মোটালোক অনেক আছে , অসঙ্গতি কিছু নেই তাদের মধ্যে, কিন্তু হঠাৎ ঐ উদরটার আড়ালে যতসব বিকৃতি আর কদর্যতাই আমার চোখে পড়ল। মনে হল যেন বিরাট একটা ফোঁড়ার মতো--লোভ, বিদ্বেষ, কুরুচি আর কুৎসিৎ কামনাকেই প্রকাশ করছে। আর এই সব কুৎসিৎ কামনাকে এমন নীচ, বিশেষ করে এমন বিকৃত উপায়ে তৃপ্ত করা হয় যে সেভাবে কোন পশুও করে না। দেখলাম হীনতম ক্ষুধার সেবায় নিযুক্ত কলুষিত মনের বিকার। তারপর হঠাৎ বেদের প্রার্থনার মতো কি যেন আমার ভেতর থেকে উৎসারিত হল, ''হে ভগবান! এসব যেন অবশ্যই দূর হয়ে যায়।
''

শারীরিক কষ্ট, পৃথিবীর ধনসম্পদের অসম বন্টন, এসবের পরিবর্তন হতে পারত বুঝতে পারি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমাধানের সাহায্যে এসবের প্রতিকারও সম্ভব, কিন্তু মনের কদর্যতা,প্রাণের বিকৃতি , এসবের পরিবর্তন হতে পারে না---এরা পরিবর্তিত হতে চায় না। বিষাক্ত বিকৃত মনপ্রাণ যাদের, আগে থাকতেই তারা অভিশপ্ত, তারা বিলুপ্ত হবেই---এই হল আদিম পাপের তাৎপর্য,মনের সঙ্গে সঙ্গে এই পাপ ও বিকারের শুরু হয়েছে।

মানুষের মধ্যে যারা অতিমানসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে ও নিজেদের মুক্তিসাধনে সক্ষম, তাদের জীবন সম্পূর্ন রুপান্তরিত হবে, তারা একটা আসন্ন সত্যের দিকে এগিয়ে চলেছে, বাহ্য আকৃতিতে এখনো যা প্রকাশিত হয়নি। যারা পশুসুলভ সারল্য ও প্রকৃতির কাছাকাছি আছে, তারা আবার প্রকৃতির মধ্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকবে,কিন্তু মানবচেতনার এই কলুষিত অংশটি, দীর্ঘকাল যাবৎ মনের বিকৃত ব্যবহারের দরুন যে সচেতনভাবে মিথ্যা ও স্থিতিকে অনুমোদন করে, সে অংশটি সম্পূর্নভাবে অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

পৃথিবীর ইতিহাসের আবর্তনে বহু জীবশ্রেণী যেমন নিস্ফল বলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, এই ধরনের মানবগোষ্ঠীও তেমনি বিবর্তনের গতিপথে অচল ও ব্যর্থ বলে বিনষ্ট হয়ে যাবে।

অতীতের কয়েকজন ভবিষ্যৎদ্রষ্টার চোখে এই অবস্থাটা ধরা পড়েছিল। কিন্তু যা হয়ে থাকে, সব জিনিসই গুলিয়ে গেছে, কেননা দূরদৃষ্টি থাকলেও তাঁরা সেই অতি মানসিক জগতের সন্ধান পাননি,যে জগৎ রুপান্তর ইচ্ছুক এক মানবশ্রেণীকে উন্নত জীবনের দিকে তুলে ধরবে এবং এই জড়জগৎকে পরিবর্তিত করবে। সেই জন্যেই এই বিকৃত মানবচেতনার মধ্যে যারা জন্ম নিয়েছে তাদের আশা দেবার জন্যে তারা বিশ্বাসের সাহায্যে মুক্তিলাভের জন্য শিক্ষা দিয়েছেন। যে ভগবান জড়ের মধ্যে আত্মদান করেছেন,তাঁর প্রতি যাদের বিশ্বাস আছে তারা স্বাভাবিকভাবেই অন্য জগতে গিয়ে মুক্তি পাবে। শুধু বিশ্বাস চাই, বুদ্ধিহীন, বোধহীন যে বিশ্বাস সেই বিশ্বাস।এইসব ভবিষ্যৎদ্রষ্টারা যেমন অতিমানসিক জগতের সন্ধান পাননি,তেমনি এ সত্যও তাঁদের অগোচরে থেকে গেছে যে বিবর্তন, অর্থাৎ জড়ের মধ্যে ভগবানের আত্মদান একদিন জড়ের মধ্যে ভগবানের প্রকাশের মধ্যে দিয়েই চূড়ান্ত রুপ নেবে।

জড়ের মধ্যে মনের অবতরনে যে বিকৃতি, কদর্যতা ও হীনতার সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে দুঃখ যন্ত্রণা ও মানসিক দৈন্য এসব বেড়ে গিয়ে নীচ জঘন্য রকমের দুর্দশার আর অন্ত নেই, এক বিরাট মানব শ্রেণীর গোটা জীবনটাই কি বীভৎস হয়ে উঠছে এতে,--- অতিমানসিক জগৎ এসবই ধ্বংস করবে। এসবই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বাধ্য। এ-সবের জন্যেই পশুদের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত সারল্য ও সংহতির জীবনের চেয়ে মানুষ অনেক দিক থেকে বহু বহু নীচে আছে।

শুধুমাত্র স্বার্থসিদ্ধির জন্যে মনকে ব্যবহার করে করে একটা গোটা মানবশ্রেণী এত বিকৃত হয়ে গেছে যে পশুরাও কখনো তাদের মত এমন হীন মর্মান্তিক দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করে না।

আমাদের হয় ঊর্ধ্বে উঠে আলোক ও সুষমার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে , নয়তো পশুর বিকৃতির সুস্থ সরল জীবনে নেমে আসতে হবে।

অনুবাদ ঃ তীর্থনাথ সরকার (শ্রীমার World tension এর ভাবানুবাদ)

''আমাদের লক্ষ্য রাজনীতিক নয়, সামাজিকও নয়--তা আধ্যাত্মিক।আমরা চাই ব্যষ্টি হিসাবে মানুষের চেতনার রুপান্তর, বাহ্য ব্যবস্থার বা শাসন-পদ্ধতির পরিবর্তন মাত্র নয়।আর এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্যে আমরা কোন মানুষী উপায়ের উপর নির্ভর করি না-- তা যত শক্তিমানই হোক না---আমাদের একমাত্র আশ্রয় ভগবৎ-প্রসাদ। -----শ্রীমা

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা

(দ্বিতীয় অধ্যায়-২)

'বেটা সাধনা তো ম্যায় সিদ্ধি প্রাপ্তিকে লিয়ে নহী করতা হুঁ" ফির কিঁউ লগে হুয়ে হ্যাঁয়?" মেরি সাধনা সির্ফ উনকে সাথ জুড়ে রহনে কে লিয়ে। যবতক সাধনা হ্যায় তবতক ইয়হ শরীর চলেগী। যিসদিন সাধনা রুক যায়েগী, সাঁস ভী রুক যায়গী। শরীর পঞ্চভূত সে বনী হয় ফির উসী পঞ্চভূতমে লীন হো যায়গী। গঙ্গীর জলের দিকে তাকিয়ে বোললেন--যবতক ইয়হ জলকি ধারা বহেগী তবতক গঙ্গা রহেগী। যিসদিন ইয়হ জল নহী রহেগী, উসদিন ইয়হ গঙ্গা ভি নহি রহেগী। বেটা ইস শরীরকে লিয়ে কর্ম হ্যায়, কর্ম্মকে লীয়ে শরীর নহী। কর্ম্ম এক অমর মাধ্যম হ্যায়।

ইয়হ কর্ম্ম হি সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকো এক নিয়ম সে নিয়ন্ত্রিত কর রহা হ্যায়। কর্ম্ম রুক জানে সে ইয়হ সৃষ্টি, ইয়হ ব্রহ্মান্ড লুপ্ত হো যায়গা।"কথাগুলো কিছুদিন পূর্বে হৃষিকেশের এই গঙ্গার ধারে এক সাধু মহারাজ বলেছিলেন। আশ্চর্যজনকভাবে তখনো গোধূলী বেলা ছিল। ঠিক কথা আমি আমার দেখার যন্ত্রনা যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায় তখনই সেই সব দেখা অভিজ্ঞতাগুলোকে লিপিবদ্ধ করি। অদ্ভূত ব্যাপার লেখা শেষ হয়ে গেলে যন্ত্রনাও শেষ হয়ে যায়। মনের ভেতরে অভিজ্ঞতার ঘাত প্রতিঘাতের ফলে যে আলোড়ন হয় সেগুলো শান্ত হয়ে যায়।তাছাড়া ঘটনাগুলো কালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকে না। ব্যাগটি আবার কাঁধে ফিরে এলো,নিজের অজান্তেই হাতটা ভেতরে ঢুকে গিয়ে একটি পান্ডুলিপি উঠে এলো। এর বেশিরভাগ চরিত্র জীবিত। লেখার নিয়মে স্থান এবং কালকে ঠিক রেখে চরিত্রগুলোর নাম ও গঠনে কিছু পরিবর্তন করা হলো। কারন বেশিরভাগ চরিত্রের অধস্তন পুরুষরা বর্তমান। তবে মঙ্গলামাসী নামটি অপরিবর্তিতই রইল। এর সাথে গল্পের মূল চরিত্রের জীবনটি জড়িয়ে রয়েছে যা খুবই সংবেদনশীল। ---মুসাফীর।

"দেখতে দেখতে মঙ্গলামাসীর মাঠ ছোট হয়ে গেল "

বিশ্বে প্রথম ঐশ্বর্যশালী পরিবেশ রচনার জন্য সংগ্রহ করুন গ্রন্থ "মহাসাহিত্য"

অন্তহীন বেদনা-১ম খন্ড ● অন্তহীন বেদনা-২য় খন্ড

Endless Pain - 1st Part.

বিশ্বে প্রথম গ্রন্থ " আত্মা ও মন(গাণিতিক বিশ্লেষণ)" সংগ্রহ করুন।
অঙ্কের সাহায্যে আত্মা ও মনের চরিত্র বিশ্লেষণ।
দেশ ও বিদেশের আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত রচনার পূর্ণ রুপ এই গ্রন্থ।

প্রকাশক ঃ কর্পোরেট পাবলিসিটি
লেখক ঃ নির্ম্মলেন্দু দাস
(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

"ভগবানের সাহায্য ছাড়া সাধনার কাজ কেউই করতে পারে না, কিন্তু সে সাহায্য তো সব সময়েই হাজির রয়েছে। "--শ্রীমা

(গত সংখ্যার পর)

সদ্য বিয়ে হয়েছে , দীপু বলে শালা খুব মজা নিচ্ছিস । অভির দিকে তাকিয়ে বলে তোর এটাই লাস্ট ব্যাচেলরস ট্রিন ও বেটাতো কোনদিন বিয়ে করবে না। দেব বলে তোরা যদি আমাকে বাদ দিস তাহলে আর কি করবো আমাকেও বিয়ে করতে হবে। ওরা তিনজনেই হেসে উঠে। দীপু বলে আমাকে এখন উঠতে হবে একটা এগজিকিউটিভস ডিনার মীট আছে। বেশি টানিস না--বউ ঘরে ঢুকতে দেবে না। মুচকি হেসে দীপু বেরিয়ে গেল। দেব বলে আমার অনেক দিনের ইচ্ছে একবার ভাগলপুরের প্রবাসী বাঙ্গালীদের দুর্গাপুজোটা দেখি। তোর নিজের জায়গা ওখানকার কালচারটাও কিছুটা জানা ও দেখা যাবে। অভির একটা খুব গভীর এবং স্পর্শকাতর জায়গা ও মনের ভেতর রয়েছে।অনেক সময় কথাবার্তায় কিছু কিছু বিষয় অভি শেয়ার করেছে। তাতে দেবের কাছে এটা পরিস্কার যে অনুরাধার মতো উডবি লাইফ পারটনার পেয়েও ওর ভেতরে একটা এমন কিছু বেদনা রয়েছে যার জন্য মাঝে মাঝে বিচলিত হয়ে পড়ে। ওরা অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। দেব ঠিক করেছে অভিকে এই অবস্থা দেখে থেকে বের করে নিয়ে আসতে হবে যেভাবেই হউক। সেই জন্য ভাগলপুর যাওয়ার কথা ভাবছে। দ্যাখ তুই যে ভাগলপুর দেখতে চাইছিস সেটা এখন দেখতে পারি না। আমুলব পরিবর্তন হয়ে চলেছে। তোর ভাল লাগবে না আর আমার ভাললাগার কোন জায়গাই নেই। তার চেয়ে বরং চল পাহাড়ে যাই তুইও ভালবাসিস আমিও ভালবাসি।তবে তোকে কথা দিচ্ছি ভাগলপুরের প্রবাসী বাঙ্গালীদের কালচারের জীবন্ত ছবি তোর সামনে তুলে ধরবো । অভি খুব ভাল বক্তা কলেজ লাইফ থেকেই। ও যখন কিছু বলে তখন শ্রোতাদের মনে হয় যা শুনছে সেটা যেন জীবন্ত হয়ে সামনে দেখা যাচ্ছে। ঠিক হলো সিকিমের পেলিংয়ে যাওয়া হবে।

(ক্রমশ)

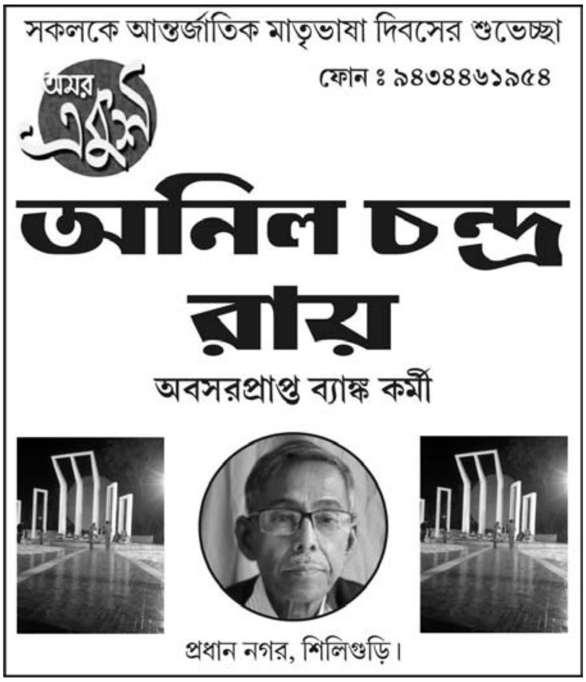

"এদিকে সাহায্যও চাইবে আর ওদিকে অবিশ্বাসও করতে থাকবে,তাতে কোনো কাজ হয় না, বিশ্বাসটি থাকলে সব-কিছুই জলের মতো সহজ হয়ে যায়। "--শ্রীমা

কচলিয়ে চোখ

দুলাল দত্ত
(প্রধান শিক্ষক, শিলিগুড়ি হিন্দি হাইস্কুল,শিবমন্দির ,শিলিগুড়ি)

দুয়ারে ভোর ঠেলছে প্রাতে
“ কান্ডারী সব আঁখ খোল”
সঠিক পথে চালাও নায়ে
ধান্দাবাজি সব ভোল।
নদীর স্রোতেও তুফান আসে
বাওকুলানী বৈশাখে
এটাও তোদের নয় অজানা
সামনে ঝোলা মৌ-শাখে
তবুও কেন উদাস এত
পরকে নিয়ে তাল ভোলা
নিজের আল দিব্যি বাধা
পরের যত্ত সব খোলা
ভোগ জগতে মত্ত হয়ে
আম জনতা পোষ্য সব
অভুক্তেরে ছিটিয়ে খুদ
করছ বন্ধ ওদের রব।
মা যে তোদের মা যে মোদের
কারুর একার নিজের নয়
তাকে নিয়েই নিত্য খেলা
দেখছে সারা বিশ্বময়
শয়তানিতে দৃষ্টি খোলা
ভাল কাজে ইচ্ছে কম
অসৎ যত বন্ধু প্রানের
সৎকে ভাবো পিওর যম।
কচলিয়ে চোখ দ্যাখ না চেয়ে
ওরাই তোদের পিত্ত যে
ওদের প্রানেই প্রান যে তোদের
নইলে তোরা রিক্ত হে।

সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা
ধ্রুব সরকার

মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাভাষা প্রেমী সকল মানুষের কাছে আবেদন জানাবো, সবাই যেন এই মহান সমৃদ্ধ ভাষার উন্নতিকল্পে নিজেদের প্রচেষ্টা জারি রাখেন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যেন উদ্বুদ্ধ করেন এই ভাষা চর্চার প্রতি। উত্তরসূরীদের মধ্যে বাঙালি মনিষীদের পরিচিতিও যেন করান সকলে মিলে।

পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি।

সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা
আশীষ ঘোষ
শিক্ষক
অমর একুশে

মাতৃ ভাষা দিবসের এই শুভ সময়ে বলবো, সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার করা হোক। প্রতিটি নাম ফলক, যানবাহনে যেন বাংলা থাকে তারজন্য আমাদের সকলেরই ভাবা উচিত। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বাংলা ভাষাকে বাধ্যতামূলক করা হোক অন্তত পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে। বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষা করা হোক।

পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি।

“সম্পূর্ণভাবে অচঞ্চল হয়ে নির্ভয়ে যদি থাকতে পারো তাহলে মারাত্মক রকমের বিপদ কোনো-কিছু আসতেই পারে না। ”--শ্রীমা

বাংলা লিপির আদিকথা

অনিল সাহা
(সম্পাদক, উত্তরের প্রয়াস, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি)

ভাষা ও সাহিত্য যেন গতিশীল নদীর ন্যায়। জাতির আবেগ যতদিন তাকে হিল্লোলিত করে, ততদিনই সেই ভাষা ও সাহিত্য প্রগতির ধারাটি সূচিত হয়। হিল্লোল না থাকলে কল্লোল জাগে না, তেমনই জাতীয় জীবনে সৃষ্টির আবেগ না থাকলে তাতে জীবনের কলধ্বনি সূচিত হয় না । জীবনের এই কল ধ্বনিই তো মসির রেখাঙ্কিত হয়ে সাহিত্যের রুপরেখার আত্মপ্রকাশ করে। শৈবাল দামে আকীর্ণ হলে নদীর ধারা যেমন ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে আসে তেমনি ভাব ও চিন্তার জগতে সৃজনশীলতার অভাব ঘটলে সাহিত্যের প্রগতির ধারাটি থমকে যায়।

খ্রিষ্টীয় নবম শতকের শেষে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে বীজটি অঙ্কুরিত হয়েছিল তার ফলে ফুলে শাখাপ্রশাখায় , পত্রে পল্লবে সুশোভিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের মহীরূহে পরিণত হয়েছে।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব।স্বাভাবিক অবস্থায় সমাজের সকলের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে হয় মানুষকে। মেলামেশার জন্য ভাবের আদান প্রদান করতে হয়। এই ভাবের আদানপ্রদান মুখ্যত হয় ভাষার মাধ্যমে। ভাষা মানুষের জন্মলব্ধ এবং স্বাভাবিক বিষয়। বিশেষত মাতৃভাষা আয়ত্ব করতে কোনো অসুবিধা হয় না। ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ সুকুমার সেনের ভাষায় ‘লতা যেমন মঞ্চ অবলম্বন না পাইলে বাড়িতে পারে না, চিন্তাও তেমনি ভাষা-অবলম্বন ব্যতিরেকে বিচরন করিতে অক্ষম।’

লিপির মাধ্যমে মুখের ভাষা স্থান কাল দেশ পাত্রের ব্যবধান অতিক্রম করে সেই

ভাব পরিস্ফূট করে। ভাষাকে স্থায়ী রুপ দেবার জন্য মানুষের চেষ্টায় লিপিমালার উদ্ভব হয়েছে।যেমন চিত্রলিপি Pictogram , ভাষালিপি Ideogram শব্দলিপি Phonogram , অক্ষর লিপি Syllabic (cript ,ধ্বনি লিপি Alphabetic Script)

ভারতীয় চিত্র লিপি থেকেই ভারতীয় লিপিমালার উদ্ভব। ভারতীয় লিপিমালার প্রাচীনতম রুপ দুটি এক) খরোষ্ঠী,দুই) ব্রাহ্মী। খরোষ্ঠী লিপিতে ডান দিক থেকে বামে লেখা হয় এবং ব্রাহ্মীতে বাম দিক থেকে ডানে লেখা হয়। তৃতীয় শতকে অশোকের সময়ে প্রচলিত ব্রাহ্মী লিপির রুপ পাওয়া গেছে একটি শিলালিপিতে।

অশোকের পর থেকে ব্রাহ্মী লিপিতে বিবর্তন ঘটতে থাকে। গুপ্ত শাসন কালে প্রচলিত ব্রাহ্মী লিপিকে কুটিল লিপি বলা হোত। জানা যায়, এই কুটিল লিপি থেকেই বাংলা লিপি ও বর্ণমালার উদ্ভব ঘটেছে।

নদী যেমন তার উৎস থেকে যাত্রা শুরু করে নানাভাবে গতি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অবিরাম স্রোতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে ঠিক তেমনই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জন্ম লগ্ন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমুদ্র অভিমুখে বিস্তার যোজনে এগিয়ে চলেছে।

সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা
দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুক বাংলা ভাষার চর্চা
সজল কুমার গুহ

সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি, শিলিগুড়ি শাখা।

“সকল রকমের পরামর্শদাতার মধ্যে ওই ভয় লোকটাই সবচেয়ে খারাপ। ”--শ্রীমা

শহিদ স্মরনে প্রদীপ ধরি

গোপা দাস

(শিবরামপল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকা
বাঁচতে গেলে ভাষাকে বুকে চেপে রাখা।
এ যেন ভালোবাসার প্রাণভোমরা,
কথায় কথায় শব্দ রং-এ আবির মাখি আমরা।
তাই ভাষা হলো রক্তে রাঙা ২১শে ফেব্রুয়ারি,
১৯৫২ সাল হলো দাবি আদায়কারী।
২০১০-এ বাংলা ভাষা হলো বিশ্ব জয়ী,
মিষ্টিতম ভাষা বলে পেলো স্বীকৃতি।
এই কারণে তোমাকে নিয়ে গর্ব করি --
শহিদ স্মরনে আমরা প্রদীপ ধরি।

অমর একুশ

তন্ময় ঘোষ

(শিবরাম পল্লী, শিলিগুড়ি)

বুকের ভিতর গর্ব মোদের বাংলা ভাষার ছন্দ,
বাংলা মোদের সবার প্রাণে, বাংলা গানে আনন্দ।।

বাংলা ভাষায় মাকে ডাকি, প্রথম বাংলাতে হাতেখড়ি,
বাংলা ভাষা শক্তি মোদের, বাংলাতেই লেখা ধরি।।

ভাষার দাবিতে চলেছে মিছিল, দলে-দলে নর-নারী,
রফিক-বরকতের রক্তে ভেসেছে একুশে ফেব্রুয়ারী।।

বাংলা ভাষা মোদের অহঙ্কার, বাংলা মোদের প্রাণ,
আজও কানে বাজে বাংলা ভাষায়,রাম-রহিমের গান।।

বাংলা মোদের মাতৃভাষা, বন্দিত বিশ্বজুড়ে,
এস দোর খুলে, সবে মিলি গলে, আজ একুশের ভোরে।।

বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী সম্মান দেওয়া হোক
সর্বত্র সাইনবোর্ডে ইংরেজি ও
হিন্দির সঙ্গে অবশ্যই যেন বাংলা ভাষার ব্যবহার হয়

সজল কুমার গুহ

শিবমন্দির
সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও
সংস্কৃতি সমিতি, শিলিগুড়ি শাখা।

ডাঃ মুকুন্দ মজুমদার
তোমায় আমরা ভুলছি না ভুলবো না
বাংলা ভাষার জন্য তোমার লড়াই
আমাদের কাছে অমর হয়ে থাকবে।
তোমায় জানাই প্রণাম, তোমার বিদেহী
আত্মার শান্তি কামনা করি।

**স্মৃতিকণা মজুমদার
ও সদস্যবৃন্দ**
বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি

"আন্তরিকভাবে আত্মনিবেদন করে ফেলতে পারলেই আমরা সকলরকমের গন্ডগোল ও বিপত্তির হাত থেকে বেঁচে গেলাম।
"--শ্রীমা

বাংলা ভাষা শিখলে চাকরির নিশ্চয়তা দরকার

ধ্রুব সরকার
(পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি)

আমি রেলে চাকরি করতাম। অবসর নিয়েছি। অবসর সময়ে যে কাজটি করি, তা হলো কোথাও বাংলা ভাষা নিয়ে আন্দোলন হলেই আমিসেখানে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করি। বাংলা ভাষা নিয়ে বিভিন্ন স্থানে প্রচার করে যাচ্ছি।

সকলকে আমি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার জন্য এক মাইল স্টোন। বাংলাদেশে বাংলা ভাষা বাঁচানোর জন্য যে আন্দোলন হয়েছিলো তাতে বহু লোকের প্রান গিয়েছিলো আর তাতে বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়। এরসঙ্গে ১৯শে মের কথাও বলতে হয়। শিলচরেও বাংলা ভাষার জন্য বাঙালিরা আত্মবলিদান করেছিলেন। অথচ দুঃখের হলো যে ভাষার জন্য অনেকে শহিদ হলেন, অনেক আন্দোলন হলো সেই ভাষা বাঁচানোর জন্য আজ তেমনভাবে উদ্যোগ নজরে আসছে না। বর্তমানে বাঙালিদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, নিজের ভাষার প্রতি একটা অনীহা দেখছি। শিলিগুড়িতেই দেখবেন, অনেক বড় বড় বাড়ি হচ্ছে। বাড়িগুলোতে দেখবেন ইংরেজিতে বাড়ির নাম লেখা হচ্ছে। উচ্চারন বাংলায়, লেখা ইংরেজিতে। বাংলা শব্দ ইংরেজিতেলেখা। কুসুমকুঞ্জ বাংলা শব্দ লিখছেন ইংরেজিতে। আবার দেখুন সোস্যাল মিডিয়ায় অনেকে বাংলা অক্ষর ইংরেজিতে লিখছেন। ইংরেজি হরফ ব্যবহার হচ্ছে।ছেলেমেয়েকে সবাই ইংরেজি স্কুলে পাঠাচ্ছেন। বাংলা মাধ্যমগুলোর অবস্থা শোচনীয়। বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলো এখন ইংরেজি মাধ্যমে যাওয়ার চেষ্টা করছে। শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল ইংরেজি বিভাগ চালু করে দিয়েছে। কেন এমন হচ্ছে, আমার মনে হয় বহু বাঙালির একটা ধারনা হয়েছে বাংলা শিখলে তা আলঙ্কারিক হবে, আবেগের সুড়সুড়ি দেওয়া হবে। কিন্তু পেটের ভাত হবে না। বাংলা ভাষা না শিখলে চাকরি পাওয়া যাবে না এমন নয়। ভাষা রক্ষা করে জনসাধারণ। বই লিখে প্রবন্ধ লিখে ভাষা রক্ষা করা যাবে না। সাধারণ মানুষ যদি ভাষা শেখে, ভাষা ব্যবহার করে তবে সেই ভাষা টিকে থাকবে। কিন্তু কেন সাধারণ মানুষ বাংলা ভাষা শিখবে? আজকাল বাস্তব জগৎ। সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট। সেই কারনে আমি বলবো , বাংলা ভাষা একমাত্রা বাঁচাতে পারে যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভাষার একটি ব্যারিকেড করে। বাঙালিরা আজকাল কোনো প্রতিযোগিতাতেও যেতে পারে না। একসময় বাঙালিরা ইংরেজি শিখে গোটা ভারতে দাদাগিরি করেছে, কিন্তু অপরপক্ষ যখন ইংরেজি শিখে ফিল্ডে নামলো তখন কিন্তু বাঙালিরা আস্তে আস্তে পিছু হটেছে। সুভাষ বোস একজনই হয়। সবাই সুভাষ বোসের মতো লড়াই করতে পারে না। সাধারণ বাঙালি হচ্ছে কলহপ্রিয় না। সাহিত্য, নাচ গান নিয়েই থাকে। বাস্তবের কঠিন লড়াই করে থাকার বিষয়টি পারে না। তাই আমি বলবো, পশ্চিমবঙ্গে অন্তত এমন ব্যবস্থা করা হোক যাতে বাঙালি ছেলেমেয়েরা বাংলা শিখলে চাকরি পাবে। অন্যান্য রাজ্যে কিন্ত সেখানকার আঞ্চলিক ভাষায় প্রশ্ন হয় চাকরির পরীক্ষায়। আর তাদের চাকরিও হয়। কিন্তু বাংলাতে তা নেই। ইংরেজি বা অন্য ভাষা বাঙালিরা জানুক। কিন্তু বাংলা ভাষা শিখতেই হবে। আমি বিদেশেও ছিলাম। পর্তুগীজ কলোনিতে যখন ছিলাম দেখেছি তারা ইংরেজি স্কুল চালু করেছে বর্হিজগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য।

সবশেষে বিশেষ শ্রদ্ধা জানাবো বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটির সভাপতি ডাক্তার মুকুন্দ মজুমদারের প্রতি। তিনি সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। বাংলা ভাষার জন্য তিনি নিঃস্বার্থভাবে লড়াই করে গিয়েছেন। বয়স হয়ে যাওয়ার পরও তিনি পিছু হটেননি। বাংলা ভাষা রক্ষার জন্য দিনরাত তিনি যুদ্ধ করে গিয়েছেন। ওনার সংগঠনের নাম বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি থাকায় প্রথমে অনেকে আপত্তি করেন। পরে তারা বুঝতে পারেন , সত্যি বাংলা ভাষা বাঁচানোর জন্য সংগঠন দরকার। ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি।

"জয় আমাদের নিশ্চয় হবে, এই দৃঢ় বিশ্বাসটি মনে আনতে পারলেই আমরা ধৈর্যের সঙ্গে যে-কোন মিথ্যা ও ভয় বিরুদ্ধ আক্রমনের সম্মুখীন হতে পারি। "---শ্রীমা।

ভাষার প্রতি ভালোবাসা থেকেই এই বয়সে লড়াই করছি

সজল কুমার গুহ
(সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি, শিলিগুড়ি শিবমন্দির)

সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা। মাতৃভাষা দিবস নিয়ে কিছু বলার আগে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা জানাই সদ্য প্রয়াত ডাক্তার মুকুন্দ মজুমদারের প্রতি। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর দায়িদায়িত্ব, তাঁর লড়াই সবসময় স্মরন করতে হবে। তাঁর চলে যাওয়া আমাদের কাছে বিরাট ক্ষতি। তাঁর বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি সংগঠনের নামই সব বলে দেয়। বাংলাকে বাঁচাও বাংলা ভাগের হাত থেকে। বাংলা ভাষাকে বাঁচাও, তাঁর কথা আমরা সবসময় স্মরন করি। মাতৃভাষা দিবস নিয়ে আলোচনা করলে তাঁর কথা বলতেই হবে। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। সদ্য প্রয়াত বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডঃ বিমলেন্দু দামের প্রতিও শ্রদ্ধা জানাই। সম্প্রতি তিনি প্রয়াত হয়েছেন। বাংলা ভাষার জন্য তাঁর অবদান স্মরন করতেই হবে।

তাঁর আত্মারও শান্তি কামনা করি।

আমার লেখা ছোট্ট একটি কবিতা দিয়ে লেখা শুরু করি। 'একুশ আবার এসেছে দুয়ারে, তোমায় আমায় দিচ্ছে ডাক/ একুশ আবার এসেছে দুয়ারে, তোমায় আমায় দিচ্ছে ডাক /ভাষা শহিদ বলছে যেন ভাষার তরে রয়েছে অনেক ফাঁক/ ঘরে ঘরে হোক চর্চা মাতৃভাষা বাংলার/ তৃপ্তি হোক বরকত রফিক জব্বর সালাম কমলাদের আত্মার/ ভাষা বিবেক জাগাতে হোক আরও আরও ভাষা মঞ্চ তৈরি/ করি পালন পবিত্র উনিশে মে , পয়লা নভেম্বর ও মহান একুশে ফেব্রুয়ারি। ' এই তিন তিনটি ভাষা দিবস আমাদের কুড়ে কুড়ে খায় সেইসব নামগুলো --আব্দুল বরকত, রফিকউদ্দিন আহমেদ,সফিকুর রহমান, আব্দুস সলাম, আব্দুল জব্বার,অহিউল্লাম, আব্দুল আওয়াল ও এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি।প্রণাম তাদের। বাংলা ভাষা এক মাধুর্যমন্ডিত ভাষা। পৃথিবীর মিষ্টতম ভাষা বাংলা। আপনারা জানলে অবাক হয়ে যাবেন দশ হাজার পূর্বে দশ কোটি ভাষা ছিল। সেটা এখন এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র সাড়ে ছয় হাজার আনুমানিক। আরও দুঃখের ও কষ্টের যে পৃথিবী থেকে প্রতিদিন চৌদ্দ দিন অন্তর পৃথিবী থেকে একটি করে ভাষা বিলুপ্ত হয়। আরও শুনে অবাক হবেন, রাষ্ট্র সংঘ জানিয়েছে বেশ কয়েকবছর আগে-- এই শতাব্দীর শেষে ভারতবর্ষ থেকে ১৯৭টি ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

একুশে ফেব্রুয়ারি চলে এসেছে। আমাদের আবেগ শুধু একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে হলে চলবে না, সারা বছর যদি আমরা মাতৃভাষা নিয়ে চর্চা করি তবেই ভালো। তুমি তোমার ভাষা চর্চা করো, অন্যের ভাষাকে সন্মান করো। কিন্তু নিজের ভাষা বাংলাকে অবহেলা করে নয়। অভিভাবকদের তাই সচেতন হতে হবে। ঘরে ঘরে বাংলা ভাষার চর্চা করাতে হবে অভিভাবকদের। ছেলেমেয়ে ইংরেজি স্কুলে পড়তেই পারে। আমার নবছরের নাতি স্নেহাশিস ইংরেজি স্কুলে পড়ে। ও কিন্তু বাড়িতে বাংলা ভাষার চর্চা করে। ও পনের কুড়িটি বাংলা ভাষায় আবৃত্তি অনর্গল করে যেতে পারে।

আমরা ধারাবাহিকভাবে বাংলা ভাষার প্রচার করে যাচ্ছি। আমরা বিভিন্ন সময় সন্মানিত হয়েছি বাংলা ভাষার চর্চার জন্য। ২০১৯ সালে শ্রেষ্ঠতম শাখা হিসাবে আমরা দিল্লিতে সন্মানিত হয়েছি। ভাষা সংগ্রামী হিসাবে সন্মান পেয়েছি। এই সন্মান আমার ব্যক্তিগত নয়, এইসব

সম্মান আমি সব ভাষা শহিদদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে চাই। সময়ে সময়ে বাংলা ভাষার জন্য এত আত্মনিবেদন হয়েছে যে কোনো জাতির তা নেই। ১৯৫৬,১৯৬১, ১৯৫২তে এত অবদান যে বলার নেই। মানভূম দিবস, ভাষা শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস মানে একুশে ফেব্রুয়ারি। তাই আসুন আমরা দায়বদ্ধ হই। শুধু আবেগ নয়, শুধু কবিতা নয়-- ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপে নিজের ছবি দেওয়াই নয় ।আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে বাংলা ভাষার জন্য। আমরা শিলচরে গিয়েছিলাম, ওখানে এক শহিদের সহধর্মিনীকে প্রণাম জানিয়ে গান শুনতে শুনতে আবেগমথিত হয়ে যাই। আমি, অনিলবাবু, আশীষবাবু,সুলেখা। ৭৫ বছরে, বীরেন্দ্র সূত্রধরের সহধর্মিনী ধনকুমারীদেবী। দুবছর আগে তিনি চলে গিয়েছেন।

একুশে ফেব্রুয়ারির বার্তা একটাই, নিজের মাতৃ ভাষার প্রতি দায়বদ্ধতা। আমি আমার ঘরেই চর্চা করি। আমার নাতির কথা বললাম। ও বাংলা ভাষা অনর্গল বলতে পারি। ঘরে ঘরে কেন বাংলা ভাষার চর্চা কেন হবে না? ছেলেমেয়েকে ইংরেজি মাধ্যমে দিন কিন্তু বাংলা ভাষার চর্চা হোক।

এবারে আমরা কালনা যাচ্ছি একুশেফেব্রুয়ারির আগে ।পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা কলেজে অনুষ্ঠান রয়েছে। ঐতিহাসিক শহর কালনা। ওখানে সারাদিন ধরে আমাদের কর্মসূচি রয়েছে। পদযাত্রা হবে। আলোচনা হবে। সেখানে পত্রিকার উন্মোচন হবে। যৌথভাবে সবার কবিতা নিয়ে রঙিন পত্রিকা প্রকাশ করছি।

এই বিশেষ দিনে আমরা অনেক আলোচনা করি। কিন্তু সারা বছর ধরে আমরা চাই বাংলা ভাষার চর্চা হোক। শিলিগুড়িতেও আমাদের অনুষ্ঠান রয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারি। নতুন ছেলেমেয়ে যারা স্মার্ট বয়, তাদের বলি রাষ্ট্রীয় মস্তিস্ক অনুসন্ধান থেকে ডাঃ নন্দিনী সিং বলেছেন, নিজ মাতৃ ভাষায় শিক্ষা গ্রহন করলে তা সম্পূর্ন হয়, অন্য ভাষাতে করলে তা সম্পূর্ন হয় না, অর্ধেক হয় তা।

আমরা মাতৃভাষা নিয়ে একের পর এক আন্দোলন করে যাচ্ছি। বিভিন্ন সরকারি অফিসে বাংলাতে ফলকলেখার জন্য আবেদন করে যাচ্ছি আমরা। আমাদের আন্দোলনের ফলে কুড়িটি সরকারি বেসরকারি সংস্থায় বাংলা সংযুক্ত হয়েছে। অনেক অফিসে ইংরেজিতে শুধু সাইনবোর্ড ছিলো, সেখানে এখন বাংলায় সাইনবোর্ড তৈরি হয়েছে। বাগডোগরা বিমানবন্দর, এল আই সি, প্রতিরক্ষা বিভাগে, ইন্ডিয়ান ওয়েল। এটা আমাদের বিরাট সফলতা। বিশেষ বিশেষ দিনে আমরা মনিষীদের ওপর আমরা পত্রিকা প্রকাশ করি। বাংলা মনিষীদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে শ্রদ্ধা জানাই। আমার এখন ৭১ বছর বয়স চলছে। ভাষার প্রতি ভালোবাসা আছে বলেই এই লড়াই করতে পারি। বাংলাদেশেও গিয়েছি একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। শিলচরের শহিদ স্তম্ভেও গিয়েছি। পুরুলিয়ার মানভূম আন্দোলনও নিশ্চয়ই জানা আছে।

তবে এবারে একটি খবর বলি, বাংলা ভাষা হয়তো এবারে ধ্রুপদী ভাষার সম্মান পেতে চলেছে ।আমরা বহু দিন ধরে বাংলা ভাষার ধ্রুপদী সম্মানের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। সবশেষে সকলকে আবারও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা।

"মানুষের প্রেমে একটু তিক্ততা থাকবেই, কেবল ভগবানেরই প্রেমে কিছুমাত্র ব্যর্থতা নেই।"--শ্রীমা

ভাষা সংরক্ষনের প্রয়োজনীয়তা

কবিতা বনিক
(মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি)

মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য যা উপাদান, উপকরন অর্থাৎ শব্দ, ধ্বনি ইত্যাদির প্রয়োজন, সেই সব গুছিয়ে অন্যদের কাছে সঠিক ভাবে পরিবেশন করা যাতে বক্তা ওশ্রোতা তাদের পরস্পরের মনের ভাব বুঝতে পারবেন তখনই ভাষার সার্থকতা। ভাষা আবার ব্যাকরনগত ত্রুটির কারনে, কালের প্রভাবে, সামাজিক , ভৌগলিক ইত্যাদি পরিবর্তনের কারণে, গোষ্ঠীদের মধ্যে ভাগাভাগির কারণে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আমরা একই কারণে বাংলা ভাষারও যেমন নানান অঞ্চলের নানান ধরনের টান, উচ্চারন, ধ্বনি ইত্যাদির নানান ব্যবহার দেখতে পাই এমনি অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রেও হয়। ব্যাকরনগত সমস্যা এর প্রধান কারণ। সমস্যা যেমনই হোক তার সংরক্ষন খুব জরুরি। ভাষা লুপ্ত হয়ে গেলে বা হারিয়ে গেলে ওই ভাষার সাথে ওই জনজাতির অভিজ্ঞতার নানান মূল্যবান তথ্য , নিয়মাবলী , প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার , নানান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, নানান ওষুধপত্র ইত্যাদি হারিয়ে যায়। ফলে আমরা অসহায় হয়ে পড়ি। ভাষার সংরক্ষন তাই সবচেয়ে জরুরি। আমরা এমনই ঐতিহ্যমন্ডিত আমাদের ভাষা জননী“সংস্কৃত ভাষা” সংরক্ষনের অভাবে ও কঠিন ভাষা এই ভুল ধারণার ফলে আমাদের প্রাচীন ঋষিমুনিদের আবিস্কারের অনেক তথ্য, ন্যায়, নীতি, অনেক নিয়মাদি, যোগ সম্পর্কিত তথ্য, অঙ্ক শাস্ত্র, রসায়ন শাস্ত্র, মূল্যবান জ্যোর্তিবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, ওষুধপত্র ইত্যাদি হারিয়ে ফেলেছি, ভাষার ব্যবহার না করার জন্য। সংরক্ষন করতে না পারার জন্য অনেক পুঁথি লুটতরাজ হয়েছে, অনেক জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নষ্ট হয়েছে।অথচ ভারতবাসী এক জাতি এক প্রাণের মত আসমুদ্র হিমাচলএর প্রতিটি কোনায় আজও সবাই সংস্কৃতমন্ত্রেই রোজ প্রণাম, পুজো করেন। নানারকম শুভ অনুষ্ঠান, পুজো,শ্রাদ্ধাদি ইত্যাদি সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারনের মধ্য দিয়ে করেন। এটা অভ্যাসের মত চলে আসছে আজও। কিন্তু ভাষা শিক্ষার অভাবে বই পড়তেপারি না। আশ্চর্যের বিষয় হল পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের মানুষ সঠিক সংস্কৃত উচ্চারন করলে সেই উচ্চারনের টান বা স্বরের কোন পার্থক্য হবে না। একইরকমশোনাবে। এর কারণ হল সপ্তম শতাব্দীতে তৈরি পাণিনির সংস্কৃত ব্যাকরণে ‘অষ্টাধ্যয়ী’। এটাই ইতিহাসে সর্বপ্রথম ব্যাকরণ। পাণিনির শিষ্য পতঞ্জলি অষ্টাধ্যয়ীকে সহজভাবে ব্যাখা ও বর্ণনা করেন। এই ব্যাকরন এতটাই শুদ্ধ ও সহজ যে সপ্তম শতাব্দী থেকে আজ একবিংশ শতাব্দীতেও সংস্কৃত ভাষার একটুও ধ্বনি, উচ্চারন বা অন্য কোন ভাবেই বিকৃত হয়নি।

তাই আমরা সচেতন হয়ে ভাষা সংরক্ষনে সচেষ্ট হব। মানুষ অন্যান্য ভাষা আগ্রহ সহকারে শেখে, সেইগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, জীবনযাপন ইত্যাদি জানার আগ্রহে। শিক্ষিত সমাজ অবশ্য সচেষ্ট হবেন ভাষার বিকৃতি যাতে না হয়,লুপ্ত যেন না হয় কোন ভাষা। সঠিকভাবে যে কোন ভাষার ব্যবহার ব্যক্তিত্বকেও সুন্দরভাবে প্রকাশ করে। আজকাল বাংলা ভাষার ওপর দুর্যোগ নেমে এসেছে।স্কুল-কলেজে বাংলা ভাষার সঠিক প্রয়োগ পদ্ধতির অভাবে আনন্দ রস পায় না। ফলে বাড়িতেও ভাষার প্রতি জোর দিতে পারেন না অভিভাবকরা। ফলে বাংলা ভাষা থেকে দূরে চলে যাচ্ছে বাংলার ছেলেমেয়েরা। বাংলা সংস্কৃতি, সাহিত্য, জীবন-যাপন বাঙালি মণিষীদের, বীর শহীদদের কাহিনী, বীর গাঁথা সব ধরা ছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেল। অন্য ভাষাকেও যে ভালভাবে শিখছে তা নয়। এর কারণ যারা নিজের ভাষায় সাবলীল নয় তাকে অন্যরা সম্মান করতে চায় না। যেহেতু এটা বিশ্বায়নের যুগ, সে কারণেই যারা নিজেকেই জানে না তাদের অন্যরা কিভাবে সম্মান করবে। নিজেকে,নিজেদের সংস্কার,সংস্কৃতিকে ঠিক মত জানতে পারলে তবে অন্যদের ভাষা সংস্কারকে ও অন্তত বুঝতে পারবে, বিকৃত করবে না। এইরকম অর্ধ শিক্ষার কারণে রুচি, ভাষা বদলে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। যে কোন ভাষাকে সুষ্ঠুভাবে ধরে রাখতে গেলে ভাষা চর্চার যেমন প্রয়োজন তেমনি সংরক্ষণ প্রয়োজন।

“তোমার নিজের মন্দিরগুহার সবচেয়ে গভীরে চলে যাও, সেখানেই তুমি আমার দেখা পাবে। ”--শ্রীমা

২১শে ফেব্রুয়ারি

নির্মলেন্দু দাস

(কবি চন্দ্রচূড়---শিবরাম পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

অর্ন্তমুখী দ্বন্দ থেকে মুক্তি দিলাম ২১শে ফেব্রুয়ারি।
অজস্র কাব্যের ধ্বনি দিয়ে চিনে নিলাম আমরা উত্তরসূরী।
শুধু সেই রক্তিম আভার স্মৃতির প্রতিচ্ছবি সঙ্গে করি
আমরা করেছি আহ্বান ২১শে ফেব্রুয়ারি।

সেইসব উত্তাল দিনের উৎফুল্ল উচ্ছাস প্রাণবন্ত ধ্বনি,
ভূমিকম্প আসা মৃদু কম্পনের মত কান পেতে শুনি।
ভেসে আসে অসংখ্য মানুষের নিঃশর্ত ঢেউয়ের শব্দ।
নিঃস্তব্ধ শহরের মাটি ফেটে চৌচির, শুঁকি বারুদের গন্ধ।
ভেঙ্গে যায় ছোট ছোট হাট, বিকল গাড়ির মতো পরিত্যক্ত।
অথচ ২১শে ফেব্রুয়ারি আজও জাগ্রত।

অত্যন্ত চেনা মুখ ফিরোজা, রিজিয়া বেগম, নমিনা, আক্তার
ঘরের দরজা করে উন্মুক্ত।
অথবা আলত শীতে হঠাৎ যেন সেইসব রমনীর খসে পড়া বোরকা।
শিশির ভেজা সন্ধ্যায় নামাজ পড়ে বালিকা
কাছে থাকে শুদ্ধ তারকা।

নিঝুম রাতের রাত্রি কাটে, মূঢ় মুখে ফুটে ওঠে নানা ভাষা।
সোনার বাংলার বুকে জেগে থাকে সে এক অন্য আশা।
ওদিকে মসজিদে মজলিসে বারকত, জব্বার,সালাম কিম্বা
রফিকের কঠিন দাপটে কেঁপে ওঠে দুঃশাসনের গিরি।
আলগা হয় উপড়ের সিঁড়ি।

দশের কোঠার ছেলের হাতে ওঠে আগুনের সংকল্প।
সন্মানহীন রাজনীতি ডুবে যায় সঙ্কটে।

অজস্র অসংখ্য মৃত্যুর ছাড়পত্র নয়,
ভাষার চরম পত্রে ভেঙ্গে পড়ে মাটিতে দর্পের গর্বিত পর্বত।
ঢাকার বুকে রক্তের দাগ গড়ে তোলে বাংলার ইজ্জত।

২১শেফেব্রুয়ারির শেষে তপ্ত স্মৃতির স্বর্ণ দ্বারের দেশে
মন থাকে পরে স্বপ্ন দেউলের পাশে।
কান পেতে শুনি নরম চুড়ির আনন্দ
কে যেন আলপনা আঁকে দোরে, রঙিন ভাষা অফুরন্ত।
সত্যি কোন প্রেম দিশারী প্রেমিক বিবির মন থাকে না ঘরে,
ন্যাংটা কোন দামাল ছেলে শক্ত হাতে বৃক্ষরোপন করে।
হিসাব করে চলার মত বয়স গেছে চলে,
হিসাব করে বলার মত শব্দ গেছে ভুলে।
এখন শুধু স্বাধীন পুরুষ, নারীর কন্ঠে আসে সুর,
সবুজ ঘাসের প্রাণের কোণে কোণে জেগে থাকে ভাষার পুকুর।

২১শে ফেব্রুয়ারির দিন আসে ফিরে ফিরে,
কথার কথা নানান কথায় আমাদের সভা ঘরে
প্রেয়সীর রাঙা হাতে পঞ্চ প্রদীপ জ্বলে,
শহিদের প্রাণে থাকে শতায়ুর প্রাণ।
সফলতা জেগে ওঠে, ভেঙ্গে যায় বেদনার কঠিন বেদী।
ওপাড়েতে দীপ জ্বলে, এপাড়ে আলোর ছটা আসে,
মাঝে থাকে মানুষের গড়া ভিন্ন দিক, ভিন্ন দেয়াল।
তবু তুমি আমি ভালোবাসি,
কাছে থেকে আরো কাছে আসি।
ঘুরে ফিরে তোমাকে স্মরণ করি,
ভাষাহীনে ভাষা দিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি।

"একেবারে স্থির ও শান্ত হয়ে যেতে পারলে তুমি নিজেই জানতে পারবে যে কোনটা করা সবচেয়ে ভালো।"--শ্রীমা

মিষ্টি মধুর বাংলা ভাষা

মুকুল দাস
(বয়স--৯৮, শিবরাম পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

বাংলা ভাষা বাঙালির কোমল হৃদয় জুড়ে,
এই ভাষা আসে সবার কাছে বার বার ঘুরে।
বাংলা ভাষা সহজ সরল যেন চকচকে সোনা,
এই ভাষা স্বর্ণ ভাষা সকল ভাষার গহনা।

যতই থাকুক দুঃখ কষ্ট--- এই ভাষাতে সুখ
রাত পোহালে দেখি তাই বাংলা ভাষার মুখ।
বাংলা ভাষা মাতৃ ভাষা, এই ভাষাতে বল ভরসা।
বাংলা ভাষায় চাওয়া পাওয়া, নানান পরিক্রমা,
এই ভাষাতে শিশু প্রথম শিখে বলা মা, মা,মা।
বাংলা ভাষায় বর্ণ পরিচয়, বিদ্যাসাগর দিয়েছে দিশা,
মানুষ হওয়া বড় হওয়া পূরন করে সবার আশা।
বাংলায় আছে নানা জাতি, নানা পোষাক পরিচ্ছদ,
বাংলা ভাষা বাঙালির গর্ব,সকল ভাষার মিষ্টি সম্পদ।
বাংলা ভাষায় রাজা রবি, মন্ত্রী নজরুল
আছে সাথে সুকান্ত, জীবনানন্দ, অতুল।
একালের সেকালের কবিরা সব ওদের সেনাপতি,
হাজার লেখক লিখছে লিপি, লিখছে কত গীতি।
মিষ্টি মধুর এমন ভাষা আর নেইকো কোথা,
বিশ্বের মানুষ জানে সবাই, এই মুকুট অহংকার থাকবে বাঁধা।
এই ভাষাতেই বাউল করে গান,
সতেজ রাখে বাঙালির প্রাণ।

২১শে ফেব্রুয়ারি ও কিছু কথা

নির্মলেন্দু দাস
(কবি চন্দ্রচূড়, শরৎপল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

একনায়কতন্ত্র শব্দটির মধ্যে স্বাধীনতা হরণকারীদের কথা মনে করিয়ে দেয়। ভূখন্ড স্বাধীন হওয়া মানে জনগণের স্বাধীনতা নয়।এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্থানে। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পূর্ববঙ্গ এবং১৫ আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। দেশ স্বাধীন হবার পর রাষ্ট্র নেতাগণ দেশের নানা প্রকল্প উন্নতি নিয়ে চিন্তাভাবনা এবং কাজে রুপান্তরিত করবার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। এটাই স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের যে যৌক্তিকতা স্বীকার করেছিল সেখানেই ছিল একনায়কতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি যে কারণে এক ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন সফল হওয়ায় তারা একটিমাত্র ভাষা (উর্দুকে) রাষ্ট্রভাষা করার স্বপ্ন দেখেছিল, যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষীদের ইচ্ছাকে ধুলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্থানের উর্দুভাষী রাষ্ট্রপ্রধানদের ইচ্ছানুসারে পশ্চিম পাকিস্তানের মতো পূর্ব পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা শুরু করা হয়েছিল। সংগ্রামের সূত্রপাত এখান থেকেই।এমন প্রস্তাব পূর্ব পাকিস্থানিরা মেনে নিতে রাজি হননি। সেজন্য শিক্ষাবিদ, শিক্ষক ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবী সংগঠন সেদিন সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন। বাংলা ভাষা যাতে রাষ্ট্রীয় ভাষা না হয়, সেজন্য ১৪৪ ধারা,কার্ফু জারি করে আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ১৯৫২ সালের ২১ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের উপর এই নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। লাঠিচার্জ, কাঁদুনে গ্যাস বাদ যায়নি। কিন্তু কোনোভাবেই যখন ছাত্রদের আটকাতে না পারায় পুলিশ বাহিনী সরকারের নির্দেশে গুলি চালায় । পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায় আবুল বরকত,আবদুস সালাম, আব্দুল জব্বার ও রফিকউদ্দিন এর মতো কিছু তরুন প্রাণ। বাংলা ভাষাকে আটকানো যায়নি। স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল সেদিনের সরকার। পরে ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়।তাই প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষার শহিদগণের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই সবাই।

“একেবারে স্থির ও শান্ত হয়ে যেতে পারলে তুমি নিজেই জানতে পারবে যে কোনটা করা সবচেয়ে ভালো।”--শ্রীমা

বাংলা ভাষা আন্দোলন ও ডাঃ মুকুন্দ মজুমদার

স্মৃতিকণা মজুমদার
(প্রয়াত ডাঃ মুকুন্দ মজুমদারের স্ত্রী, সল্ট লেক, কলকাতা)

২১শে ফেব্রুয়ারি , আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে সামনে রেখে এই কথাই বলা যায় যে বাংলা ভাষা রক্ষার আন্দোলন এবং ডাঃ মুকুন্দ মজুমদার অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। ডাঃ মুকুন্দ মজুমদার ছাড়া বাংলা ভাষা আন্দোলনের কথা ভাবাই যায় না।

২০০১ সালে উত্তরবঙ্গ সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁর লেখা রেলে 'বাংলা ভাষা চাই' এর মাধ্যমেই বলা যায় তাঁর বাংলা ভাষা আন্দোলনের শুরু। সেই আন্দোলন তিনি আমৃত্যু চালিয়ে গিয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা ভারতে আজ বাংলা ভাষা চারদিক থেকে আক্রান্ত ও বিপন্ন। শুধুমাত্র লেখালেখির দ্বারা এ বিষয়ে বাঙালিকে সচেতন করা যাবে না। বাংলা ভাষাকে রক্ষা করতে হলে পথে নেমে সক্রিয় আন্দোলনের প্রয়োজন।তাই তিনি বাঙালির কাছে আবেদন রেখেছেন,''বলুন--আমি ভারতীয় বাঙালি, বাংলা আমার মাতৃভাষা, এই আমার আত্ম-পরিচয়। বাঙালি জাতিসত্তা ও জাতি-গৌরবে আমি গর্বিত।'' সংবিধানের অষ্টম তপশিলভুক্ত সব ভাষার সমান মর্যাদা ও অধিকারের ভিত্তিতে গঠিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে হিন্দিও সব ভাষার সমান এবং একই সারিতে। পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ভাষা বাংলা ও ইংরেজি,হিন্দি নয়। হিন্দি কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসে ইংরেজির সাথে কাজকর্মের সরকারি ভাষা। তাই তিনি দাবি করেছেন, পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র সরকারি ভাষা হতে হবে বাংলা। ১৯৫৬ সালের রাজ্য পুর্নগঠন কমিশনের অভিমত, যে ভাষার

জনসংখ্যা রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ বা বেশি, সেই ভাষাই হবে রাজ্যের সরকারি ভাষা। ২০১১ সালের জনগণনায় দেখা গিয়েছে ,পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি জনসংখ্যা ৮৫ শতাংশ। তাই আইন ও সংবিধান মেনে বাংলা ভাষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাংলা ভাষাকে একমাত্র সরকারি ভাষা করতে হবে। এবং নেপালি, উর্দু ও হিন্দি ভাষার সরকারি স্বীকৃতি বাতিল করতে হবে।

সব ভাষা-সংখ্যালঘুর বাংলা শেখা বাধ্যতামূলক করতে হবে, /বাংলার মধ্যে অবস্থিত সি বি এস ই, আই সি এস ই সহ সব স্কুল ও কলেজে বাংলা শেখা বাধ্যতামূলক করতে হবে,/বাংলা ভাষা রক্ষা করা, সমৃদ্ধ করা,প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি করার জন্য বাংলা ভাষা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে,/ত্রি-ভাষা সূত্র মেনে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে রেল সহ কেন্দ্রের সকল সংস্থায় বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। বাংলার মধ্যে রেলের রিজার্ভেশন চার্টে ইংরেজি ও হিন্দির সাথে বাংলায় লেখার জন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রেল বোর্ড ও তৎকালীন রেল মন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদবকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। /শিলিগুড়ি এনজেপিতে রেলের বিভাগীয় কার্যালয়--ডি আর এম অফিস খোলার দাবিও জানানো হয়। /কেন্দ্রের সব পরীক্ষায় যেমন আই এ এস, আই পি এস এ ইংরেজি ও হিন্দির সাথে বাংলা ভাষায়ও পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকতে হবে। শুধুমাত্র ইংরেজি ও হিন্দিতে পরীক্ষায় দেবার ব্যবস্থার জন্য বাংলার ছাত্ররা কেন্দ্রের চাকুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। /পশ্চিমবঙ্গে দোকান, অফিস, আদালত , স্কুল , কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ সব ধরনের প্রতিষ্ঠানে বাংলায় সাইনবোর্ড লিখতে হবে। অন্য ভাষায় লেখা যাবে তবে বাংলায় লেখা থাকবে সবার উপরে। /অবিলম্বে ভারতীয় সেনা বাহিনীতে বাঙালি রেজিমেন্ট গঠন করতে হবে। বিশাল ভারতবর্ষের মানচিত্রে ভারতের ১৩ কোটি বাঙালির আত্ম-পরিচয় সুপ্রতিষ্ঠিত করার অন্যতম প্রধান উপায় ভারতীয় সেনা বাহিনীতে বাঙালি রেজিমেন্ট গঠন।

শুধু এই সব দাবি নয়, বাঙালিকে ও বাংলা ভাষাকে সংরক্ষিত রাখতে তিনি আরও অনেক বিষয় নিয়েই পথে নেমে আন্দোলন

"সকল প্রার্থনাই সফল হয় যদি তোমার ধৈর্য ও অধ্যবসায় থাকে।"--শ্রীমা

করেছেন। তিনি যখনই দেখেছেন বাংলা ভাষার উপর রাজ্য বা কেন্দ্রের খাড়া নেমে এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি গর্জে উঠেছেন,‘এটা হতে পারে না, হতে দেবো না’।

ডাঃ মুকুন্দ মজুমদার তাঁর ভাষা আন্দোলন শুধু উত্তরবঙ্গেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। দক্ষিনবঙ্গে এই আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটির শাখা সংগঠন গঠন করেন। এর মাধ্যমে কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগরের মূর্তির পাদদেশে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এবং সল্টলেকের করুনাময়ীতে কয়েকবারই ২১শে ফেব্রুয়ারি পালনের অনুষ্ঠান করেন। এছাড়াও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মধ্যে অবস্থিত ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইন্দুমতী হলের সভায় বাংলা ভাষা রক্ষার আন্দোলনে অগ্রনী ভূমিকা পালনের জন্য ডাঃ মুকুন্দ মজুমদারকে বিশেষ সন্মান জানানো হয়। কলেজ স্কোয়ারে স্টুডেন্টস হল সহ বিভিন্ন হলে তিনি অসংখ্য মিটিং করেছেন। কলকাতা ও দক্ষিনবঙ্গের বিশিষ্টজনেরা সেখানে উপস্থিত থেকেছেন। এছাড়া হাওড়া, হুগলি, নদীয়া, দক্ষিন ও উত্তর ২৪ পরগণার বিভিন্ন জায়গায় তিনি মিটিং মিছিল করেছেন বাংলা ভাষা আন্দোলনের মূল মন্ত্র সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। কলকাতা(সল্ট লেকে) বই মেলায় শতাব্দী প্রাচীন প্রকাশনা সংস্থা মিত্র এবং ঘোষ প্রকাশনার উদ্যোগে ইংরেজি লিপিতে বাংলা সহজপাঠ, বর্ণ পরিচয়, আবোলতাবোল বই গুলির ‘‘বেংলিশ বুকস’’ নামকরন করে প্রকাশের সিদ্ধান্তে তিনি পুলিশের কঠোর বাধা অতিক্রম করে মিত্র এবং ঘোষ স্টলের সামনে জোরালো প্রতিবাদ জানান এবং বিধাননগরে অবস্থিত এস ডি ও এর মাধ্যমে এর প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপিও দেন।

এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় ডাঃ মুকুন্দ মজুমদার ছিলেন বাংলা ভাষা আন্দোলনের প্রান পুরুষ। জোর দিয়ে বলতে পারি আজ পর্যন্ত অন্য কোন বাঙালি ডাঃ মজুমদারের মতো প্রানপাত করে সর্বস্ব দিয়ে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করতে পথে নেমে আন্দোলন করেনি। দিনের পর দিন শিলিগুড়ির রাস্তায় রাস্তায় তাঁর গলায় রেকর্ড করা বক্তৃতা মাইকে বাজানো হতো বাংলা ভাষার বিপন্নতা , বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে চক্রান্ত এবং বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটির দাবি বাঙালি জনগণের কাছে তুলে ধরতে ও তাদের সচেতন করতে।

বাংলা ভাষার ওপর তাঁর অজস্র লেখা আনন্দ বাজার পত্রিকা, বাংলা দৈনিক স্টেটসম্যান,দ্য স্টেটসম্যান, যুগ শঙ্খ এবং উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে। যখনই বাংলা ভাষা সম্পর্কে কোনো আলোচনার ডাক এসেছে ছুটে গিয়েছেনসেখানে।নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সন্মেলনের গোয়ালিয়রের অধিবেশনে বাংলা ভাষার উপর তাঁর বক্তৃতা রীতিমতো আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। এবং ডিসেম্বর ২০০৬ সালে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সন্মেলন থেকে প্রকাশিত বইতে ডাঃ মুকুন্দ মজুমদারের বাংলা ভাষার উপরে একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। সব থেকে গৌরবের কথা ওই বইতে ১৯২৩ সালে এই সন্মেলনের প্রতিষ্ঠা দিবসে দেওয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষন প্রকাশিত হয়েছিল।

মাঝে মাঝে আমাদের লন্ডনে যেতে হতো। সেখানেও প্রবাসী বাঙালিদের যেসব বাংলা সংগঠন আছে তাদের অনুষ্ঠান বা সভায় বাংলা ভাষার সমস্যার কথা তুলে ধরতেন। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পথসভা, ব্যানার, প্ল্যাকার্ড নিয়ে মিছিল করা ছিল তাঁর নিত্য দিনের কার্যক্রমের অঙ্গ।প্রয়োজনে নিজেই রাস্তায় নেমে দেওয়ালে পোস্টার লাগাতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

ডাঃ মুকুন্দ মজুমদারের ত্যাগ ও আন্দোলনের গুরুত্ব আজ বাঙালি কতটা বুঝতে পারছে জানি না। তবে যেদিন বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতি কোনঠাসা হতে হতে নিশ্চিহ্ন হবার পথে যাবে সেদিন ডাঃ মুকুন্দ মজুমদারের আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা এবং তিনি কেমন লোক ছিলেন আশা করি বাঙালি বুঝতে পারবে।

বিলেত ফেরত একজন শ্রেষ্ঠ চক্ষু চিকিৎসক হয়েও সর্বস্ব ত্যাগ করে বাংলা ভাষা, বাঙালি জাতি এবং বঙ্গভূমি রক্ষার আন্দোলনে নেমেছিলেন। তিনি ছিলেন সহজ, সরল,পরোপকারী, সাধারণ জীবনযাপনে বিশ্বাসী একজন সত্যনিষ্ঠ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মানুষ।

ডাঃ মজুমদার বলতেন, বাংলা ভাষা , বাঙালি জাতি ও পশ্চিমবঙ্গ ভূমিকে সুরক্ষিত রাখার লড়াই অনন্ত কালের লড়াই। অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত বানী ‘ Arise,awake ,stop not till the goal is reached ’ তুলে ধরে বলছি এটাই ছিল ডাঃ মুকুন্দ মজুমদারের বাংলা ভাষা আন্দোলনের মূল মন্ত্র।

ন্যায়

প্রেনিতা দত্ত

(ঘোঘোমালি ফল বাজার রোড, শিলিগুড়ি)

অন্যায়ের চোখরাঙানি চিপে ধরে ছিলো টুঁটি,
রক্ত মাখা ন্যায়ের আদায় প্রান দিয়ে তাই লুটি।
অধিকারে ছড়ি ঘোরায় জাতভেদী বর্বর,
প্রান দিয়ে ন্যায় কিনলো রফিক আর জব্বর।
ঘামে মাখা ধুলায় ঢাকা দিগন্তরের পানেস
অমর একুশ আজও বেঁচে সেই বাউলের গানে।

“ভগবানের কৃপার উপরে নির্ভর করো, তাঁর ইচ্ছা ও তাঁর কাজের উপরে পূর্ণ আস্থা রাখো, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।”--শ্রীমা

বই মেলায় বাংলা বইয়ের প্রতি আগ্রহ

কলমে গনেশ বিশ্বাস

(শিবমন্দির, শিলিগুড়ি, ফোন ৯৮৩২৪৪৫৫০৪)

ডিসেম্বর মাসের শুরুতে উত্তরবঙ্গ জুড়ে শুরু হয়েছে বই মেলা। সারা বছর ধরে অনেকমেলাই হয় আমাদের রাজ্যে। অন্য মেলাগুলোর বিষয় আমি বলতে যাচ্ছি না। আমি বলতে যাচ্ছি আমাদের বই মেলার বিষয় খুব আনন্দের বিষয়। বিগত কয়েক দশক ধরে দেখতে পাচ্ছি গল্পের বইয়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ কমেছে। বর্তমানে মোবাইলের যুগে আমাদের বইপ্রেমীরা কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। একজন সাহিত্যপ্রেমী হিসেবে এসব ভাবলে খারাপ লাগে। আমাদের দেশ সবদিক দিয়ে এগোচ্ছে, কিছু কিছু দিক থেকে পিছিয়ে পড়ছে না কি? আমারতো তাই মনে হচ্ছে। একটা সময় ছিলো বিয়ে বাড়িতে উপহার হিসেবে ভালো গল্পের বই দেওয়াহোত নববধূকে। নববধূ গল্পের বইপেয়ে খুশিহোত। কারণ সে জানতো বই পড়লে জ্ঞানের বিকাশ ঘটবে। এছাড়াও নতুন পরিবেশে এসে বই পড়ে সময় কাটানো যাবে কিছুদিন। নতুন কিছু জানতে পারবো বই পড়ে খুশি হতো এই ভেবে। কালে কালে সেই সব হারিয়ে এখন মোবাইলের যুগে একমাত্র সাহিত্যপ্রেমী ছাড়া গল্পের বই বয়স্কলোকেরাও ছুঁয়ে দেখে না। বিগত কয়েক বছর ধরে লক্ষ্য করছি বই মেলা গুলোতে গিয়ে বইয়ের নেশায় না হোক, অন্য অছিলায় অভিভাবকের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা মেলায় ঘুরতেএসে দুএকটি পছন্দের বই তারা কিনছে। ভালো লাগছে বাংলা বইয়ের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ দেখে। এতে বাংলা ভাষার চর্চাও বৃদ্ধি পাবে। বাংলার প্রত্যেক জায়গায় বছরে একবার করে যদি এরকম বইমেলা করা যেতো তবে বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির পাশাপাশি বাংলা ভাষার চর্চাও বৃদ্ধি পেতো।

মাতৃ ভাষা

অর্চনা মিত্র

(প্রধাননগর, বাঘাযতীন কলোনি, শিলিগুড়ি)

মাতৃভাষা বাংলা মোদের শ্রেষ্ঠ ভালোবাসা
বিশ্বসভায় গর্ব করে রাখবো উঁচুমাথা
বাংলা ভাষার নেইকো জুড়ি
বলে গেছেন বিশ্ব কবি
বাংলা ভাষার ঐক্য গড়ে
গড়বো দীপ্ত আলো
মোদের বাংলা ভাষাই ভালো
মোদের বাংলা ভাষাই আলো
উজ্জ্বল দীপ জ্বালো
প্রশ্ন করো নিজের কাছে
বাংলা মোদের জ্ঞানের আলো।
বাংলার মাটি বড়ই খাঁটি
শস্য শ্যামল সুন্দর
গীতাঞ্জলির নোবেল জয়ী বাংলা ভাষার গর্ব
মোদের বাংলাই বিশ্ব সেরা
বাংলাই বিশ্বের গর্ব।

সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা
জয় বঙ্গ

ডাক্তার মুকুন্দ মজুমদার আমাদের মনে সবসময় বেঁচে থাকবেন
বাংলা ভাষার জন্য তাঁর লড়াই কখনোই ভুলছি না, ভুলবো না

আরতি দত্ত
(বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি)

হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি

"আধ্যাত্মিক বিষয়ে যার-তার পরামর্শ না শোনাই ভালো। প্রত্যেকেই চলবে তার আপন পথে, অন্যের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।"--শ্রীমা

মাতৃভাষা বাংলাকে ভালোবাসতে হবে

ডঃ রতন বিশ্বাস
(শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি)

একুশে ফেব্রুয়ারি প্রসঙ্গ এলেই বাংলাদেশের কথা আসবে। বাংলাদেশে যেভাবে একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবস পালিত হয় পৃথিবীর কোথাও সেভালে পালিত হয় না। আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও কম হয় না। আমাদের এখানেও তার উদ্দীপনা আছে। শুধু শিলিগুড়ি বলে নয়, কলকাতা ও তার আশপাশে বাংলা ভাষার উদ্দীপনা আছে। অসমের কাছাড়া অঞ্চলেও মাতৃভাষা দিবস আছে। তাদেরও একটা ইতিহাস আছে। একুশে ফেব্রুয়ারিতে যেমন আত্মবলিদান হয়েছে বাংলা ভাষার জন্য, কাছাড়েও কম হয় না। সেখানেও আত্মবলিদান হয়েছে। কাছাড়ে বেশিরভাগ এসেছেন সিলেট থেকে। তাদের যে স্বকীয়তা তা নিয়েও সংগ্রাম হয়েছে। মাতৃভাষা একটা অন্যরকম ব্যাপার। আমি যতই ইংরেজি বা জার্মান ভাষা বলি না কেন, সেটা কিন্তু আমার নিজের ভাষা নয়। সেইসব ভাষায় কথা বলতে গেলে আমার চিন্তা কিন্তু প্রথমে বাংলা ভাষাতেই আসে। জার্মান বলতে গেলে মাথার মধ্যে আমার মাতৃভাষা ঘুরপাক খেতে থাকে। এই মাতৃভাষাকে কেউ ভুলতে পারে না। এখন কাজের ক্ষেত্রে বা পেশার ক্ষেত্রে বা পড়াশোনার জন্য আমরা অনেকসময় অন্য ভাষা গ্রহন করি। কিন্তু তার মূলে মাতৃভাষা রয়েছে। মাতৃভাষা রক্ষার জন্য বাংলাদেশে বিরাট অনুষ্ঠান হয়। আমাদের রাজ্যেও হয়। মাতৃভাষাকে আমাদের রক্ষা করা দরকার। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য নামে একটি সংস্থা আছে গোটা ভারতব্যাপী। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সঙ্গে অতুল প্রসাদ সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যুক্ত ছিলেন। বাংলা ভাষা যাতে উজ্জীবিত হয় বা বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যও ওই সংগঠন কাজ করে। পশ্চিমবঙ্গে আমাদের দুঃখ হয় যে একটি কথা বলতে গেলে তারমধ্যে দুটা একটা করে ইংরেজি ভাষা বা ইংরেজি শব্দ প্রবেশ করছে। ইংরেজি দুটো না বললেই চলবে না। অতিরিক্ত ইংরেজি বা অন্য শব্দ ব্যবহার না করলেই ভালো। কোথাও কেউ ভাষন দিতে গেলে বাংলা ভাষনের মধ্যে অনেকের মধ্যে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করার প্রবণতা চলে আসছে । এটা কিন্তু ঠিক নয়। আমাদের বাংলা ভাষার প্রচুর শব্দ রয়েছে। সেই সব বাংলা শব্দগুলো কেন ব্যবহার করবো না? তাই বলবো ভাষাকে ভালোবাসতে হবে। ভাষা আমাদের নিজেদের প্রাণ। অনেকে এই ভাষাকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করছেন। জন্ম থেকে যে ভাষা শিখছি সেই ভাষা বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ইংরেজি স্কুলে পড়ে ইংরেজি ভাষা শিখলেও বাংলা ভাষাও শিখতে হবে। ঘরে বাংলা ভাষাই ব্যবহার করতে হবে। বাংলা ভাষাকে অবহেলা করলে চলবে না। অভিভাবকদের এজন্য দায়িত্ব নিতে হবে। ছেলেমেয়েকে ইংরেজি বা অন্য ভাষা শেখালেও নিজের মাতৃভাষা শেখান।

"অবস্থা যদি খুবই খারাপ হয়ে দাঁড়ায়, তবু উৎকণ্ঠার দ্বারা তার কোনই সুরাহা হয় না। স্থিরভাবে একটা আস্থা নিয়ে থাকলেই বরং তাতে অনেকটা জোর পাওয়া যায়।"--শ্রীমা

মাতৃ ভাষা দিবসের কবিতা

সুশ্বেতা বোস
(আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি)

১)
শোনিতাক্ত গৌরবে সিক্ত
অমর ঐতিহ্যময়ী
হাজার বছরের বাংলা ভাষার
স্বীকৃতি মধুময়ী
যে গৌরব বৃদ্ধির মূলে
সাহিত্য,কাব্য, গান
শ্যামালিমায়-রক্তগোলাপের
অস্তিত্ব চির মহান।।
২)
২১শে ফেব্রুয়ারী
রক্ত লেখা মাতৃভাষায়
তোমার বন্দনা করি।
শ্রদ্ধপূর্ণ আনন্দে মাখা
গর্বের এদিন
আমার মায়ের জন্মদিন।
৩)
মাতৃভাষা আর হয়ো না
সাম্রাজ্যবাদের শিকার
আগ্রাসনের গ্রাসাচ্ছাদনে
তোমার এ কি বিকার?
বিশ্বায়নের পটভূমিতে
ছোট ভাষা যত
জনজাতির শিকর ছিঁড়ে
বৃহৎ উন্মাদনায় রত।
মাগো আমার বাংলা আমার
তুমি আমার পূজা
বৃহৎ ভাষা যতই শিখি
স্বপ্নে তোমাকেই খোঁজা।

সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা
শিলিগুড়ি মহকুমার শিবমন্দির থেকে প্রকাশিত
উত্তরের প্রয়াসের
এবারের সংখ্যায় দ্বিশততম বর্ষে
মধূসূধন দত্তের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি
উত্তরের প্রয়াস
সম্পাদক, অনিল সাহা

শিবমন্দির , শিলিগুড়ি।

২৪তম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রাক্কালে
ভাষা শহিদদের জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা
আমাদের শপথ হোক ঃ
১) নিজ মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কাজ করা,
২) বাংলা ভাষার প্রতি যেকোনো রকম অবহেলা
অপমানের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা,
৩) ঘরে ঘরে বাংলা ভাষার চর্চা বাড়ানো,
৪) মাতৃভাষা দিবস (২১ফেব্রুয়ারি)
ভাষা শহিদ দিবস (১৯শে মে)
মানভূম দিবস (১লা নভেম্বর)
অবশ্য পালনীয় প্রতি ভাষাপ্রেমীরা।
সজল কুমার গুহ
সহ-সচিব আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতি
মুখ্য কার্যালয়
নয়াদিল্লি ও সম্পাদক , শিলিগুড়ি শাখা।
(৯৪৩৪০৩২৯৬০/৯৬৭৯২১৩০১৫/ইমেইল
sjlguha@gmail.com)

"ভগবানকে বাদ দিলে সারা জীবনটাই এক বিড়ম্বনা, আর ভগবানকে জড়িয়েথাকলে সব-কিছুই আনন্দময়।"--শ্রীমা

ভাষা সংগ্রামী মুকুন্দবাবুর প্রসঙ্গ উঠতেই কেঁদে ফেলছেন এই বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃগত দশ জানুয়ারি ২০২৩ প্রয়াত হয়েছেন বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটির সভাপতি ডাঃ মুকুন্দ মজুমদার। আগামী একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার মজুমদার প্রসঙ্গে আলোচনায় কেঁদেই উঠলেন ৮২ বছর বয়স্কা এই বৃদ্ধা। কেননা এই বৃদ্ধা প্রয়াত মুকুন্দবাবুর বাংলা ভাষা বাঁচাও আন্দোলনের সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থাকতেন। বার্ধক্যের নানা সমস্যা উপেক্ষা করে এই বৃদ্ধা যেন এক তরুনীর মতো মুকুন্দবাবুর সঙ্গে দৌড়ে বেড়াতেন। সে এক অফুরন্ত প্রান শক্তি। একুশে ফেব্রুয়ারি পালন থেকে শুরু করে উনিশে মে পালন, গোর্খাল্যান্ড বিরোধী আওয়াজ তোলা সবেতেই মুকুন্দরবাবুর সঙ্গে থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছিলেন এই বৃদ্ধা। শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ার ফ্ল্যাটে এখনসেই বৃদ্ধা আরতি দত্ত বারবার মুকুন্দবাবুকে স্মরন করছেন।তিনি বলছেন, নিজের ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বাংলা ভাষার জন্য ডাঃ মুকুন্দ মজুমদার যেভাবে লড়াই করেছেন তা তিনি কোথাও দেখেননি। আজকাল আন্দোলন বলুন বা অন্য কাজ অর্থ ছাড়া কিছু হয় না। মুকুন্দবাবুকে ভাষার আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে বহু মানুষ চাঁদা বা সাহায্য করতে চেয়েছেন । কিন্তু তিনি কারও কাছ থেকে একটি টাকাও চাঁদা গ্রহণ করেননি। আন্দোলন করার জন্য পোস্টার ও লিফলেট তৈরি, মাইকিং করা, জমায়েত করা সব কিছুতেই টাকার দরকার। একদিকে টাকা তার সঙ্গে পরিশ্রম। দুটোই মুকুন্দবাবু একা হাতেই সামলেছেন। অর্থের জন্য তিনি তাঁর বাগুইহাটির তিন তলা বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছিলেন। সেই টাকা সব বাংলা ভাষার আন্দোলনের জন্য ব্যয় করেছেন। আবার নিজের পেনশনের টাকা,রোগী দেখার টাকা সব এই আন্দোলনের পিছনে ব্যয় করতেন। এমনকি আর দশ জন ডাক্তারের মতো অতিরিক্তি রোগী দেখে নিজের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য নজর দেননি। চেম্বারে রোগীর ভিড় থাকলে আগে বাংলা ভাষার আন্দোলনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। রোগীদেরও কখনো কখনো বলে উঠতেন, আপানার চোখ একটু পরে দেখে দিচ্ছি। চলুন আগে বাংলা ভাষার ওপর অটো স্ট্যান্ডে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রেখে আসি। একুশে ফেব্রুয়ারিতে এবার তাঁরা ভাষা আন্দোলনের শহিদদের শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি মুকুন্দবাবুকে বেশি করে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন বলে আরতিদেবী জানিয়েছেন। বাংলা ভাষাকে বাঁচানোর জন্য এইরকম বড় মাপের ত্যাগী ও সংগ্রামী পুরুষ আর বাংলায় জন্মগ্রহন করবে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শ্রীমায়ের (শ্রীঅরবিন্দ) আবির্ভাব দিবস উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা

সুশ্বেতা বোস

কবি

প্রতিষ্ঠাতা,আশ্রমিকা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী

আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি।

সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা

দুলাল দত্ত

প্রধান শিক্ষক

শিলিগুড়ি হিন্দি হাইস্কুল

"ভগবানের দিকে ফেরো, তাহলে সব দুঃখই ঘুচে যাবে।"--শ্রীমা

বাংলা ভাষা নিয়ে আন্দোলন চাই

বীরেন চন্দ
(অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক, সম্পাদক-উত্তরধ্বনি)

একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের কাছে এক স্মরনীয় দিন।বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের কাছে বিশেষ দিন একুশে ফেব্রুয়ারি। কিন্তু এই বাংলা ভাষা আজ বিভিন্ন আক্রমনের মধ্যে পড়েছে। আমাদের এখন বাংলা ভাষার চর্চা বেশি করে চাই। নাম ফলকে বাংলা চাই।লেখক ও কবি সুনীল গঙ্গোপাধায় কলকাতার রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন বাংলায় নাম ফলক লেখার জন্য। সকলের কাছে তিনি আবেদন জানাতেন বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য। ছেলেমেয়েদের বাংলা শেখাতে হবে আমাদের। বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য দিয়ে গিয়েছেন। সেই ঐশ্বর্যকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। এই বাংলা ভাষা আমাদের প্রাণের ভাষা। মায়ের ভাষা। এই ভাষাকে অবহেলা আর করা চলবে না।

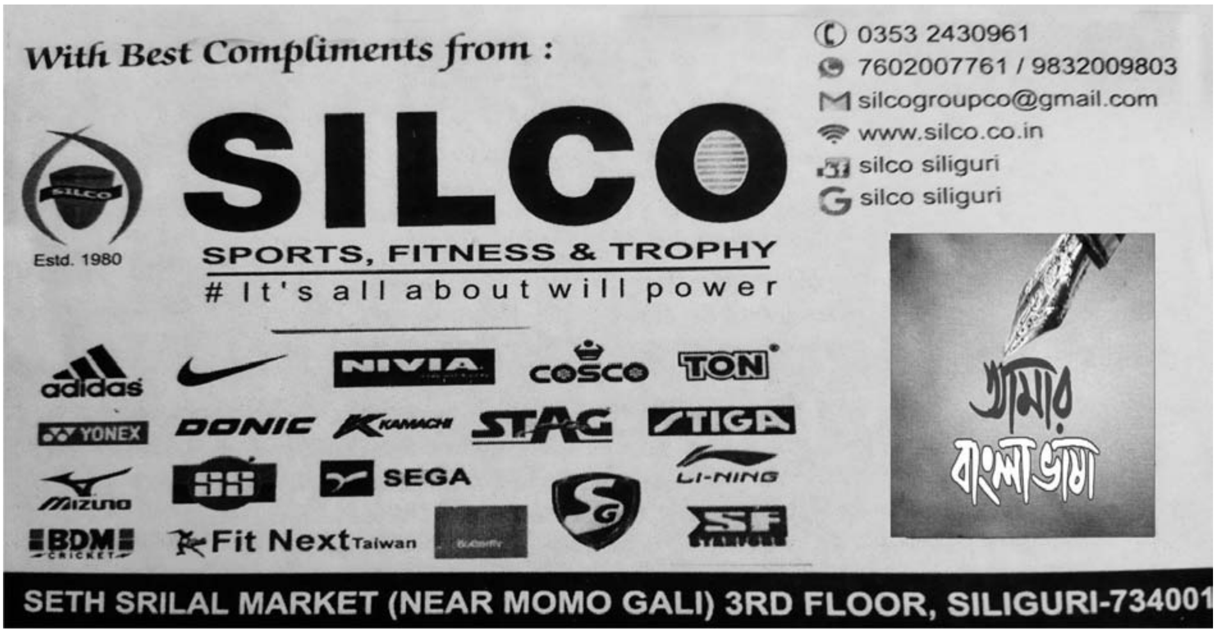

"চুপচাপ নিজের মনের আনন্দ নিয়ে থাকা, এর চেয়ে ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আর কোনো উৎকৃষ্টতর উপায় নেই।"--শ্রীমা

আমাদের মাতৃভাষা

সজল কুমার গুহ
(শিবমন্দির, সম্পাদক , আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি, শিলিগুড়ি শাখা)

যে ভাষায় ফুটেছিল আমার প্রথম বুলি,
সে ভাষা বাংলাকে মাথায় নিয়ে আজো চলি।
যে ভাষায় লেখা বর্ণ পরিচয়, সঞ্চিতা, গীতাঞ্জলি,
তা পড়ে পাই যে কি আনন্দ তা কেমনে বলি ?
যে ভাষা সাহিত্যে রয়েছে কবিগুরুর নোবেলের পরশ,
সে ভাষায় শিক্ষা মনে জাগায় হরষ।
যে ভাষায় গায়ে বিশ্বের 'মিষ্টতমের তকমা'
সে ভাষাই মোদের প্রিয় বাংলা ভাষা মা।
যে ভাষায় রচিত জাতীয় সঙ্গীত ''জনগণমন ঃঃ'' বিশ্বে শ্রেষ্ঠ,
সে ভাষা পড়তে জানতে কে না হবে আকৃষ্ট ?
যে ভাষায় আছে লেগে কতো শহিদের রক্ত,
সে ভাষার তরে গর্বিত আমিও তার এক পরম ভক্ত।
কিন্তু, যে ভাষা 'প্রাচীন', 'সমৃদ্ধ' ও 'ধারাবাহিকতা বহমান',
সে ভাষা পায়নি কেন ধ্রুপদী সন্মান ?
কারণ ? এ সন্মান লাভে চাই প্রাচীনত্ব, লিপি, পুস্তক, ঐতিহাসিক নিদর্শন,
দলিল তার হয়নি তৈরি দিয়ে বিস্তৃত বিবরন।
ধ্রুপদী সন্মান আদায় আমাদের হোক স্বপ্ন,
পেলে, বাংলা ভাষার পালকে জুটবে এক মহারত্ন।
যে ভাষায় কথা বলে বিশ্বের তেত্রিশ কোটি,
সে ভাষা ''বাংলা'', টান হোক সবার ভীষণ খাঁটি।
শেষে, ভাষা জননীর চরণে তলে জানাই প্রণতি,
'বাংলার' প্রসার, চর্চা হোক প্রতি ঘরে, এই মোর মিনতি।

চিকিৎসা নির্দেশ
কনসালট্যান্ট রিউম্যাটোলজিস্ট
ও রিহ্যাবিলিটেশন স্পেশালিস্ট
প্রফেসর -
উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের বিভাগীয় প্রধান
ডাঃ পার্থপ্রতিম পান
এম বি বি এস
এম ডি (ক্যাল) গোল্ড মেডালিস্ট
শিবমন্দির শাখা ঃ
মেডিক্যাল মোড় পেট্রোল পাম্পের কাছে
বামেশ্বরী কালী বাড়ির সামনে
ফোন ঃ ৭৬০২৯৮৬৬৯০

''ভগবান যখন যা দিচ্ছেন তা খুশি হয়ে নেবে''।--শ্রীমা

আত্ম মর্যাদা

রিয়া মুখার্জী
(শিলিগুড়ি)

ভাষা ভাষা ভাষা ভাষাই মোদের আশা,
মাতৃভাষায় আত্মপ্রকাশের সুর
আছে বেদনা আছে সুখ
মাতৃভাষায় অমর বাণী,
শুনে ঝড়ে আমাদের অশ্রুখানি
আশার আলো জ্বলে নিভে,
মাতৃভাষায় রক্ত কত শহীদের,
মনে রাখতে হবে তাদের বলিদান,
মাতৃভাষাকে করো সন্মান।

২৬ কোটি মানুষের ভাষা বাংলা ভাষা, এই ভাষার রাষ্ট্রীয় সন্মান প্রাপ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী সন্মান দেওয়া অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডঃ গৌরমোহন রায়। তাঁর মতে, দেড় হাজার বছরের পুরনো ভাষা হলো বাংলা ভাষা। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা হলো বাংলা ভাষা। বহু বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা ভাষা। এই ভাষায় শব্দ সংখ্যা এক লক্ষ ত্রিশ হাজার। বিশ্বে বাংলা ভাষার স্থান পঞ্চম। ২৬ কোটি মানুষের ভাষা হলো বাংলা ভাষা। কাজেই এই ভাষার রাষ্ট্রীয় সন্মান অবশ্যই প্রাপ্য বলে মনে করেন ডঃ গৌরমোহন রায়। এগিয়ে আসছে একুশে ফেব্রুয়ারি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

TATA TISCON
JOY OF BUILDING
Platinum Dealer
Berger
Paint your imagination
Sika
BUILDING TRUST
Auth. Dealer Auth. Distributor
deeessrana2013@rediffmail.com

DEE ESS ENTERPRISE

Retail outlet
46, Satyen Bose Road
Deshbandhupara
Siliguri-734004
Ph. : 0353-3591128

C & F Office :
2nd Floor Manoshi Appartment
Babupara, Satyen Bose Road
Siliguri-734004
West Bengal

"বিপদ এলেও যদি হাসতে পারো, তাহলে সূর্য উঠলে মেঘের যে দুর্দশা হয় ঠিক তাই হবে,--সব মেঘ তোমার কেটে যাবে।"--শ্রীমা

একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরনে

অনিল চন্দ্র রায়

(বয়স ৭৫, অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মী)

একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার আন্দোলনে এক মাইলস্টোন। পূর্ব পাকিস্তানের শাসক দল উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল। কিন্তু পূর্ব বঙ্গের মানুষেরা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মেনে নিতে চাননি। তারা ধর্মের উর্দ্ধে উঠে শুধুমাত্রা বাংলা ভাষার তাগিদে সকলে একসঙ্গে মিলিতভাবে গর্জে ওঠেন। আর সেই প্রতিবাদ আন্দোলনের ওপর পূর্ব পাকিস্থানের সরকার বর্বরভাবে অত্যাচার চালায়। সরকারের পুলিস বাহিনী রীতিমতো গুলি চালায় আন্দোলনকারীদের ওপর। সেটা ছিল একুশে ফেব্রুয়ারি। সেই গুলিতে আব্দুল, জব্বার সহ আরও কয়েকজন শহিদ হন। সেই থেকে একুশের আন্দোলন বিশ্বের ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায় রচনা করে। পরবর্তীকালে সেই দিনটি ভাষার জন্য শহিদ দিবস যেমন পালিত হয় তেমনই বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘ ওই বিশেষ দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। একুশের আন্দোলনই পৃথিবীতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রগঠনের দিকে এগিয়ে দেয়। বাংলাদেশের সেই আন্দোলন থেকে আমরা গর্বিত। এপার বাংলাতে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু এই পশ্চিমবঙ্গে আমরা সেভাবে বাংলা ভাষাকে সেভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারিনি। রাজ্যের বিধানসভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যে বাংলা ভাষাতে সব কাজ হবে। কিন্তু কোথায় সেভাবে কাজ হচ্ছে? আমি বঙ্গীয় নাগরিক পরিষদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। কলকাতাতে আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা মঞ্চ এবং সর্বভারতীয় বাংলা ভাষা মঞ্চর সঙ্গেও আমি যুক্ত রয়েছি। ত্রিভাষা সূত্র মেনে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসে ইংরেজি ও হিন্দির পাশাপাশি যাতে বাংলা ভাষার ব্যবহার হয় সেজন্য সংগঠিত আন্দোলনে আমি যুক্ত রয়েছি।

বাংলা ভাষা নিয়ে অনেক ছোট ছোট সংগঠন রয়েছে। সবগুলো সংগঠন যদি একত্রে আন্দোলনে নামে তবে সেই আন্দোলন জোরদার হবে। বাংলা ভাষা আমাদের রাজ্যে বহু ক্ষেত্রে উদাসীন। বহু ইংরেজি মাধ্যম স্কুল হয়েছে বাংলাতে। সেইসব ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোতে বাংলা ভাষা শেখানোর জন্য দুজন করে শিক্ষক নিয়োগ করলে অনেকের চাকরি হবে। আর তাতে বাংলা ভাষারও প্রচার প্রসার হবে। বাংলা ভাষী স্কুলগুলো ধুঁকছে। বাংলা ভাষা শিখলে চাকরি হবে বা বাংলা ভাষায় কাজ হবে এই বিষয়টি আজ গুরুত্ব দিয়ে ভাবনার সময় এসেছে। বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় বাংলাতে প্রশ্ন রাখতে হবে, তাতে ছেলেমেয়েরা বাংলা ভাষা শিখতে আগ্রহী হবে।

সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন ডাক্তার মুকুন্দ মজুমদার। তাঁর সংগঠনের নামই ছিল বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি। তিনি বাংলা ভাষার জন্য যেভাবে লড়াই করেছেন তা নজিরবিহীন। বাংলা ভাগের বিরুদ্ধেও লড়াই করেছেন তিনি। অনেক বয়স হয়ে যাওয়ার পরও তিনি বাংলা ভাষার জন্য অসাধারণ সংগ্রাম করেছেন।

আজকে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাংলা ভাষার চর্চা কমে গিয়েছে। বাংলার সঙ্গে ইংরেজি হিন্দি মিশিয়ে এক অদ্ভুত উচ্চারনের ভাষা তৈরি হচ্ছে। মূল বাংলা ভাষা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তৈরি হচ্ছে একটা খিচুড়ি বংরেজি ভাষা। উচ্চারনগুলো সব বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে ভাবনার সময় এসেছে।

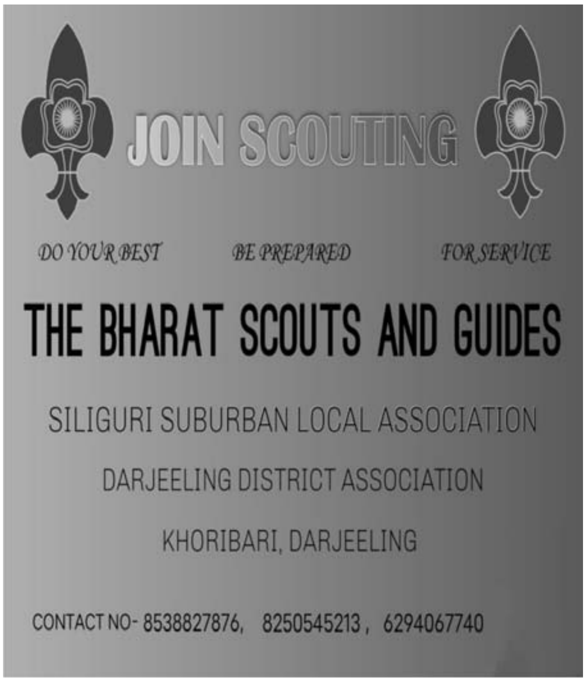

“সুখী হবার জন্যে চেষ্টা করতে গেলে নিশ্চয়ই তুমি অসুখী হবে। ”--শ্রীমা

সব ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষা চাই

অর্চনা মিত্র

(প্রধাননগর, বাঘাযতীন কলোনি, শিলিগুড়ি)

বাংলা ভাষার স্বীকৃতির দিবস হলো একুশে ফেব্রুয়ারি। এই দিনটি আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করি। ছোট থেকেই আমি সাহিত্য চর্চা করি। সাংসারিক কাজের ফাঁকে সঙ্গীত, লেখালেখি করি। অহনা নামে আমার লেখা স্বরচিত কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। তাতে আশিটি কবিতা রয়েছে। মাতৃভাষা থেকে দেশের ওপর সামাজিক সমস্যা, মনিষীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার সেই কবিতা। বাড়িতে সময় পেলেই কবিতা নিয়ে বসে পড়ি। ছেলেরা বাইরে থাকে। স্বামী অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি। ফলে অনেক সময় থাকে। আর সেই অবসর সময়ে আমি সামাজিক কাজ করি। রেড্ডি ট্রাস্ট এর মাধ্যমে আমাদের সামাজিক কাজ হয়। তার পাশাপাশি লেখালেখি করি। কবিতা চর্চা না করলে বাঁচতেই পারবো না।

একুশে ফেব্রুয়ারির পাশাপাশি উনিশে মে আমরা মাতৃভাষা দিবস স্মরন। করি। অসমের শিলচরেও কিন্তু উনিশে মে বাংলা ভাষার জন্য লড়াই করতে গিয়ে অনেকে শহিদ হয়েছেন। তারমধ্যে একজন কমলা ভট্টাচার্য।

আমদের শৈশবে বর্ণপরিচয় মুখস্থ ছিলো। এখন তা দেখি না। সেই চর্চা আবার বাড়িয়ে তুলতে হবে। বাংলাতে সব ভাষার চর্চা হোক। কিন্তু বাংলাকে অবহেলা করে নয়। সব ভাষাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু বাংলা ভাষায় সর্বত্র সাইনবোর্ড কেন হবে না? বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার সম্মান দেওয়ার জন্য আমরা দাবি করছি।

বাংলা ভাষা বিশ্বজয় করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি বা নোবেল পুরস্কারের কথা আমরা সকলে জানি। যারা অবাঙালি রয়েছেন তাদের প্রতিও বলবো, আপনারাও বাংলা শিখুন। আমরা যেমন আপনাদের ভাষা শিখবো, আমরা যেন আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবো তেমনই আমাদের বাংলা ভাষাও শিখুন। আজকাল অনেক ছেলেমেয়ে বাংলা লিখতে গিয়ে বলে যে বাংলাটা ঠিক আসে না। কেন এমন হবে?

তাই একুশে ফেব্রুয়ারি চলুন আমরা সবাই মিলে বাংলা ভাষার জন্য জোরদার আওয়াজ তুলি।

দিকে দিকে মাতৃভাষা বাংলা চাই

খোকন ভট্টাচার্য

(বিশিষ্ট ক্রীড়া প্রেমী)

সকলকে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা। বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে এই দিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই দিনেই বাংলা ভাষার জন্য লড়াইয়ে পূর্ব বঙ্গে অনেকে শহিদ হন। অনেক রক্তের বিনিময়ে সেখানে স্বীকৃতি পায় বাংলা ভাষা। পরবর্তীতে বিশ্ব রাষ্ট্র সংঘ এই বিশেষ দিনকে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। শুধু তাই নয়, একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলনই পরবর্তীতে পৃথক রাষ্ট্র বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনে বিরাট ভূমিকা পালন করে।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। কিন্তু আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে আজ অবস্থা দেখলে সত্যি দুঃখ হয়। নতুন প্রজন্ম ভুলে যাচ্ছে বাংলা ভাষা। ইংরেজি মাধ্যমের দৌলতে বাংলা ভাষা চরম অবহেলিত। আমার কথা হচ্ছে, ছেলেমেয়েরা নিশ্চয়ই ইংরেজি শিখুক।কিন্তু বাংলা ভাষাকে অবহেলা করে নয়। ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষাও শিখুক ছেলেমেয়েরা।আর বাংলা ভাষা শিখলে চাকরির একটা নিশ্চয়তা দেওয়া হবে এমন ঘোষনা হলে তা আরও ভালো হবে। পৃথিবীর বেশ গুরুত্বপূর্ণ মিষ্ট ভাষা বাংলা। এই ভাষাতে আমাদের প্রণম্য মনিষীরা যেমন রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর সহ আরও অনেকে অনেক মূল্যবান সাহিত্য সব রচনা করে গিয়েছেন। এইরকম গুরুত্বপূর্ণ ভাষাকে আমাদের নষ্ট হতে দেওয়া চলবে না।

"সুখই জীবনের চরম লক্ষ্য নয়। সাধারণ জীবনের লক্ষ্য আপন কর্তব্য করে যাওয়া, আধ্যাত্মিক জীবনের লক্ষ্য ভগবানকে পাওয়া।"--শ্রীমা

৭১ বছর আগের সেই স্মরনীয় দিন

আশীষ ঘোষ
(পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি)

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির পর এবছর অর্থাৎ ২০২৩এর একুশে ফেব্রুয়ারি পালিত হতে যাচ্ছে। মাঝখানে একাত্তর বছর পার হয়েগেলো। এই বিশেষ দিনটিকে আমরা প্রতিবছর স্মরন করি। যদিও ওই ঘটনা হয়েছিল আমাদের দেশের বাইরে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। কিন্তু এই ঘটনার মাত্র পাঁচ বছর পূর্বেও আমরা একদেশ ছিলাম। অর্থাৎ ভারত ও পাকিস্থান তখন ভাগ হয়নি। শুধু একদেশই নয়, প্রদেশের দিক থেকেও আমরা একই প্রদেশ অর্থাৎ বঙ্গ প্রদেশ বা বাংলা ছিলাম। বাংলা তখন অবিভক্ত ছিলো। এই বিশেষ দিনটিকে প্রতিবছরের মতো এবারও আমরা স্মরন করতে যাচ্ছি। কিন্তু বাংলাদেশ এই বিশেষ দিনটিকে শুধু স্মরনই করে না। তাঁরা সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারও করে। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ভাষা বাংলা হলেও আমরা খুব সামান্য ক্ষেত্রেই বাংলা ভাষা ব্যবহার করি। বাংলা ভাষার জন্য এই বিশেষ দিনটিকে পালন করতে আমাদের উৎসাহের ঘাটতি নেই। কিন্তু বাংলা ভাষার ব্যবহারে আমরা খুবই কৃপন। সরকারি বা বেসরকারি কোনো স্তরেই বাংলা ভাষা সেভাবে ব্যবহার হয় না। নতুন প্রজন্ম বাংলা সাহিত্য সেভাবে পড়ে না। বাংলা সঙ্গীতও ততটা শোনে না। তাহলে বাংলা ভাষা কিভাবে টিকবে? পরবর্তী প্রজন্মের ওপর নির্ভর করেই ভবিষ্যতে বাংলা ভাষা বেঁচে থাকার কথা। অবিলম্বে বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি চাকরির প্রতিটি পরীক্ষায় বাংলাকে আবশ্যিক করা উচিত। প্রতিটি নামফলকে যাতে বাংলা ভাষা ব্যবহার হয় তারজন্য সরকারকেই আইন করতে হবে। কানাডাতে নাকি ভাষার ব্যবহার দেখার জন্য ভাষা পুলিশ রয়েছে। তাহলে আমাদের রাজ্যে অন্তত বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য আইন থাকতে পারে। কারণ বহু আবেদন নিবেদনের পরেও অনেক বাংলা ভাষীই বাংলায় নাম ফলক লিখতে অতটা আগ্রহী নয়। অনেক বাংলা মাধ্যম কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাতে পাঠ্যক্রম বোঝানো হয় না। এরফলে অনেক ক্ষেত্রে বাংলা মাধ্যমের ছাত্রছাত্রীরা বঞ্চিত হয়। হিন্দি ভাষী রাজ্যের কলেজগুলোতে এরকম ভাবা যায় না। এই অবস্থা অবিলম্বে পাল্টানো উচিত। নতুন প্রজন্মও যাতে বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহী হয় অর্থাৎ বাংলা বই পড়ে, বাংলা সংবাদপত্র পড়ে, বাংলা সাময়িক পত্র প্রভৃতি পড়ে তারজন্য প্রতিটি পরিবারের বড়দের সচেষ্ট হতে হবে। নাহলে একদিন বাংলার প্রকাশন শিল্পও ক্ষয় হতে হতে ধ্বংস হয়ে যাবে।

বাংলা চলচ্চিত্র, বাংলা সঙ্গীত প্রভৃতির প্রচারও বিশেষভাবে করা প্রয়োজন। বাংলা চলচ্চিত্রকে প্রমোদকর মুক্ত করলে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পও বৃদ্ধি পাবে এবং প্রচারও বাড়বে। বাংলা প্রকাশন শিল্প এবং চলচ্চিত্র শিল্প উন্নত হলে কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পাবে। সর্বোপরি নিজের ভাষাকে ভালোবাসলে একুশে ফেব্রুয়ারিকে স্মরন করা সার্থক হবে।

"শত্রুর কাছে হাসতে পারলেই সে শক্তিহীন হয়ে গেল।"--শ্রীমা

মাতৃভাষা দিবস পালন তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে

পুস্পজিৎ সরকার
(শিক্ষক, সম্পাদক, শিলিগুড়ি তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি)

সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা। শিলিগুড়ি তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির যেসব প্রকল্প চলছে তারমধ্যে একটি হলো তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। শান্তিনিকেতনের আদলে পরিচালিত হয় এই বাংলা মাধ্যম স্কুলটি। একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব ছাত্রছাত্রীদের কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার কর্মসূচি আমরা নিয়েছি। সেদিন তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুল চত্বরেই অনুষ্ঠান হবে। ভাষা দিবসের গুরুত্ব সকলেই বুঝবে এটা আশা করি। সব ভাষাই গুরুত্বপূর্ণ। তবে নিজের

মাতৃভাষার তুলনা নেই। যে কোনো ভাষা শিখতে দ্বিধা নেই। ইংরেজি, জার্মানি, ফরাসি সব ভাষা মানুষ শিখুক। কিন্তু নিজের ভাষা , স্থানীয় ভাষা যাতে হারিয়ে না যায় তা দেখতে হবে আমাদের সকলকে। আর বাংলা ভাষাতো এক মিষ্ট ভাষা,সুন্দর ভাষা।

শান্তিনিকেতনের আদলে আমাদের তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুলটি চলছে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। আবাসিক হিসাবে চলে এই স্কুল। আশ্রমিক শিক্ষার পরিবেশ সেখানে রয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সুষ্ঠু পরিবেশের মধ্যে শিক্ষা গ্রহন করছে। এই স্কুলে হতদরিদ্র, যাদের কেউ নেই তারাও এখানে এসে লেখাপড়া শিখছে। বেশ কয়েকজন অনাথ শিশু রয়েছে তাদের পড়াশোনা, খেলাধূলা সবকিছু আমরা শিখিয়ে চলেছে। তাদের থাকাখাওয়ার বন্দোবস্ত রয়েছে। অসহায় এইসব শিশুকে কিছু মানুষ সহযোগিতা করছে। চল্লিশ জন অনাথ শিশু আমাদের আবাসিক হস্টেলে রয়েছে। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষরা এখানে এসে অসহায় এইসব শিশুকে সহযোগিতা করতে পারেন। ৮০ জি ধারা অনুযায়ী তারা কর ছাড়ও পাবেন। শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ি দুধা জোতে এই স্কুলের অবস্থান। কাছেই রয়েছে বুড়াগঞ্জ। সেই বাংলা মাধ্যম স্কুলে আমরা শিশুদের মধ্যে মাতৃভাষার গুরুত্ব বেশি করে প্রচার করবো একুশে ফেব্রুয়ারি। এই স্কুলের জন্য কেউ সহযোগিতা করতে চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে ৮৭৫৯১০০৮৭৬

"স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্য এখনও জগতের স্বাভাবিক অবস্থা নয়, অতএব যাতে ওর বিপরীত জিনিসগুলো না এসে পড়ে তার জন্যে আমাদের সাবধান থাকতেই হবে। "---শ্রীমা

ফেব্রুয়ারি মাস জুড়েই বাংলাদেশে অনুষ্ঠান হয়

পারভেজ চৌধুরী
(বাচিক শিল্পী, বাংলাদেশ)

একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু নিছক একটি দিন। একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবসের আগে রয়েছে শহিদ দিবস। ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যারা ঢাকা শহরে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন, তাদের স্মরন করে এবং শ্রদ্ধা জানিয়ে এই দিনটির নামকরন হয় শহিদ দিবস। পরবর্তকালে ইউনেস্কোর এই বিশেষ দিনকে স্মরন করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। পৃথিবীর সব ভাষার জন্যই এই মাতৃভাষা দিবস। এই দিবসটি ভাষা বা শহিদ দিবসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই।এই দিনটি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের সুতিকাগার বলতে পারেন। এই একুশে ফেব্রুয়ারিকে ভিত্তি করেই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র গঠনের মূল লড়াই শুরু হয়েছিলো।

পুরো ফেব্রুয়ারি মাসটা বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য একটি তাৎপর্যের মাসে। আমি কোচবিহারে দিনহাটা বা আগরতলাতে গিয়েছিলাম। সেখানেও মাতৃভাষা দিবসের বিরাট অনুষ্ঠান হয়। শিলিগুড়িতেও হচ্ছে। তবে বাংলাদেশে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত বই মেলা চলে। বইমেলা বাংলাদেশের ঢাকা থেকে অন্যত্র চলতে থাকে। বই মেলাতে একটা ভালোবাসার পরশ পাওয়া যায়।ভাষার মাসে বাংলাদেশের অন্যরকম উদ্দীপনা চলে। বই মেলাতে পারস্পরিকসৌহাদ্য বিনিময়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান হয়ে ওঠে। সারা বছর যাদের সঙ্গে দেখা হয় না তাদের সঙ্গে দেখা হয় বই মেলতে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় ভাষার মাস ঘিরে। ২০ ফেব্রুয়ারি রাত বারোটার সময় শহিদ মিনারে পুস্পাঞ্জলি দেওয়ার আবেগ রীতিমতো লক্ষ্য করার মতো বিষয়। তার সঙ্গে প্রভাত ফেরী হয়। ভাষার প্রতি মানুষের যে কি পরিমান ভালোবাসা থাকে তা সেই শহিদ মিনারের সামনে এসে দেখা যায় ঢাকাতে। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে ভাষাপ্রেমীরা সেদিন ঢাকাতে শহিদ মিনারের সামনে উপস্থিত হয়। একটি ভাষা বাংলা। সেই নামে একটি দেশ রয়েছে পৃথিবীতে। সকলকে এই দিবসের শুভেচ্ছা জানাই।

"বেচারা ভগবান! কতই না বিচিত্র রকমের দোষে তাঁকে দোষী করা হয়। এই সব দোষ যদি সত্যই তাঁর থাকতো তাহলে তাঁকে ভগবান না বলে রাক্ষস বলাই উচিত ছিল। অথচ আসলে তিনি সব দিক থেকেই অপার করুনাময়।"--শ্রীমা

‘জয় বঙ্গ ! আমি ডাঃ মজুমদার বলছি’

বাপি ঘোষ ঃ যখন তিনি ফোন করতেন, তাদের কোনো কর্মসূচির কথা জানাতেন, ফোন করেই বলতেন,‘জয় বঙ্গ, আমি ডাক্তার মজুমদার বলছি। কাল শিলিগুড়ি পৌঁছচ্ছি। দুপুর বারোটায় চলে আসবেন শিলিগুড়ি বিধান মার্কেট অটো স্ট্যান্ডে।’ এই থাকতো তাঁর মোবাইলে বার্তা। সেই বার্তা আর শুনতে পারবো না, কারণ গত ১০ জানুয়ারি কলকাতায় প্রয়াত হয়েছেন ডাক্তার মজুমদার। পুরো নাম মুকুন্দ মজুমদার। বেঁচে থাকার সময় কেউ কেউ পিছনে তাঁকে দেখে হেসেছেন, অবজ্ঞা করেছেন, পাগল ভেবেছেন। আড়ালে আবড়ালে বলেওছেন, বাংলা ভাষা নিয়ে পড়েছে এই লোকটা, পাগল আর কি!

আসলে ভালো মানুষ, প্রতিভাবান ব্যক্তিকে অধিকাংশ সময়ই সমাজ চিনতে পারে না বা বুঝতে পারে না। যখন সেই প্রতিভাবান ব্যক্তি পৃথিবী থেকে চলে যান তখন বোঝা যায় তাঁর কি গুরুত্ব ছিলো বা তিনি কিরকম ছিলেন। বাংলা ভাষার যে আর করুন পরিস্থিতি, তাতো বোঝাই যায় যারা মুকুন্দবাবুকে আড়ালেআবড়ালে পাগল বলে মশকরা করতেন। যদিও সেই সংখ্যা ছিলো কম। তবে এমনও দেখেছি শিলিগুড়ি বিধান মার্কেট দিয়ে তিনি যখন কোট প্যান্ট টাই বুট পড়ে গটগট করে হেঁটে যেতেন বহু বিধান মার্কেটের বাংলা ভাষাভাষী মানুষ ভিতর থেকে তাঁর সঙ্গে আওয়াজ তুলতেন, জয় বঙ্গ, ডাক্তারবাবু আমরা আপনার সঙ্গে আছি।

বিধান মার্কেটের অটো স্ট্যান্ড ছিল তাঁর নিয়মিত সভার ঠিকানা। ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে উনিশে মে কিংবা অন্য কোনো সময়। একসময় সেই অটো স্যান্ডের শেডের সামনে ওষুধের দোকানে তিনি রোগী দেখতেন। রোগী দেখার ফাঁকে তিনি গোর্খাল্যান্ডে বিরোধী আওয়াজ তুলতেন। বয়স হলেও কোনও ভয় না পেয়ে তিনি নিয়মিত বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতেন। আর ধারাবাহিকভাবে বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলাতে বা বাংলা ভাষার প্রচার

“ভগবান সৌন্দর্যরুপে দেহে, জ্ঞানরুপে মনে, শক্তিরুপে প্রাণে আর প্রেমরুপে চৈত্য হৃদয়ে নিজেকেই অভিব্যক্ত করেন। যখন আমরা খুব উপরে উঠে যাবো তখন দেখতে পাবো যে এই চারটি জিনিস মিলে তিনি এক হয়ে আছেন, একই জ্যোতির্ময় , শক্তিময়, প্রেমময়, মহাচেতনা।কেবল বিশ্বলীলার ক্ষেত্রেই সেই এক চেতনা বিভিন্ন রুপে অভিব্যক্ত হয়েছে। ”--শ্রীমা

প্রসার নিয়ে কথা বলায় একসময় এমন হয় যে তাঁর সেই চেম্বারে পুলিশ হানা দেয়। পুলিশি হানার পর থেকে সেই ওষুধের দোকানদার ভয় পেয়ে তাঁকে জানিয়ে দেয়, ডাক্তারবাবু আর আমাদের এখানে বসবেন না, এখানে রোগী দেখা চলবে না। পুলিশ আমাদের এখানে। ডাক্তারবাবু মনে দুঃখ পেয়েছিলেন। এই প্রতিবেদককে বলেছিলেন, দেখুন বাংলার কি অবস্থা, বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে কথা বলেছি, বাংলা ভাষার পক্ষে কথা বলেছি জন্য চেম্বারে রোগী দেখা বন্ধ হোলো। যা রোগী দেখতাম তার অর্ধেকইতো বিনা পয়সায়। এই রোগী দেখার টাকা দিয়ে কি আমার পেট ভরবে নাকি? কিন্তু আমি থামবো না। বাংলা ভাষাকে রক্ষা করতেই হবে। এরপর বিধান মার্কেট অটো স্ট্যান্ডের কাছেই ডাক্তারবাবু প্রায়ই হোটেল ভাড়া নিয়ে রোগী দেখতেন। রোজগারের জন্য নয়, সেবার জন্য। এমন ডাক্তার দেখা যায়?

আমাকে ফোনে বা দেখা হলে মিস্টার ঘোষ বা বাপিবাবু সম্বোধন করতেন। একজন বয়স্ক মানুষ, এভাবে সন্মান দিয়ে কথা বলছেন, তাঁর উন্নত শিক্ষা ও রুচির পরিচয় পাওয়া যেতো এর মাধ্যমেই। আমি অনেকবার বলেছি, আমায় নাম ধরে ডাকুন। কিন্তু তিনি শোনেননি। ব্যক্তিগতভাবে আমার চোখের কোনো সমস্যা হলেও সমাধানের রাস্তা তিনি বাতলেই দিতেন। আজ যে চশমা পড়ছি তাঁর পাওয়ার তিনিই স্থির করে দিয়েছিলেন। মানুষ হিসাবেও তিনি ছিলেন উদার মনস্ক। খুব বড় মাপের মানুষ।

বিনা পয়সায় রোগী দেখাতো ছিল তার নিত্যকার ঘটনা। আবার নিজের জমিজমা বিক্রি করে বাংলা ভাষা বাঁচাওয়ের আন্দোলনে ব্যয় করার ঘটনাও শুনেছি। যা সত্যিই নজিরবিহীন। ইচ্ছে করলেই চার চাকার গাড়ি নিয়ে তিনি ঘুরতে পারতেন। তাঁর স্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা, দুই পুত্র এবংপুত্রবধূরা সকলেই ব্রিটেনে চিকিৎসক। রোগী দেখে রোজগার করে তাঁর পেট চালানোর কোনো বিষয় কিন্তু তাঁর ছিলো না। তাঁর ডাক্তারি ডিগ্রীও বিরাট। শুনেছি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ থেকে কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে চক্ষু চিকিৎসক হিসাবেও তিনি অসাধারণ সেবা দিয়েছেন। এইরকম একজন বড়

শ্রদ্ধাঞ্জলি

"তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম
নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমানিশীথিনী-সম।।"

স্বর্গীয় বাসন্তী দে সরকার

গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে তুমি আমাদের ছেড়ে অমৃতলোকে যাত্রা করেছো। তুমি যেখানেই থাকো শান্তিতে থাকো। ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে তোমার পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম। তুমি আমাদের হৃদয়ে থেকো চিরকাল। তোমার চরণে প্রণাম, বারবার প্রণাম।

ইতি

ভাগ্যহীন /ভাগ্যহীনা

রানা দে সরকার (পুত্র), চন্দ্রানী দে সরকার (কন্যা), অর্ঘ্য সিনহা (জামাতা), অর্পিতা দে সরকার (পুত্র বধূ), রাজদীপ দে সরকার (নাতি), আরাধ্যা দে সরকার (নাতনি), অভিজ্ঞান সিনহা (নাতি)

বাবু পাড়া, শিলিগুড়ি।

"ভগবানের কৃপাদৃষ্টির সামনে কেই বা উপযুক্ত আর কেই বা অনুপযুক্ত? সকলেই এখানে এক মায়ের সন্তান। সকলের উপরেই তাঁর সমান স্নেহ। কিন্তু যার যেমন প্রকৃতি ও গ্রহনযোগ্যতা সেই অনুসারেই তাঁকে কৃপা বন্টন করতে হয়। "--শ্রীমা

মানুষ থাকতেন অতি সাধারণ জীবনযাপনে। উচ্চ চিন্তা সিম্পল লিভিং। হেঁটে হেঁটেই শিলিগুড়ির রাস্তায় তাঁকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেতো। দেওয়ালে তিনি নিজে হাতে পোস্টার সেঁটেছেন আবার নিজে হাতে বাংলা ভাষা প্রচারের লিফলেট বিলি করেছেন। এককথায় আমার দৃষ্টিতে এক অসাধারণ চিকিৎসক এবং বিরল ভাষা সংগ্রামীকে আমরা হারালাম। বয়স হলে নির্দিষ্ট সময় হলে আমাদের সকলকেই চলে যেতে হবে। কার কখন মৃত্যু হয় কেউ জানে না। সময়ের নিয়মে তিনি চলে গেলেন। কিন্তু যে কাজ তিনি করে গেলেন, যে দর্শন দিয়ে গেলেন, যে জীবনযাত্রা, যে ত্যাগ তিনি দিয়েগেলেন তা কিন্তু সচরাচর দেখা যায় না। আমরা তাঁর দেখানো পথকে শিক্ষা গ্রহন করে বাংলা ভাষার চর্চা বৃদ্ধির জন্য যত কাজ করবো ততই আমাদের বাংলা ভাষার মঙ্গল। সবশেষে তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। সবসময় মনের কোনে তাঁর সহজ সরল চলাফেরা, সহজ সরল কথাবার্তা, হাসি হাসির কথা ঘুরে বেড়াবে।

শ্রীমায়ের বাণী সমূহ

"ভগবানের জন্য কোনো কাজ করা মানেই দেহের পরিশ্রম দিয়ে তাঁর পূজা করা। "--শ্রীমা

"কেবল ভগবানের চাকরি ছাড়া আর কোনো চাকরিই আমাদের করবার নেই। "--শ্রীমা

"ভগবানের কৃপার উপর একান্তভাবে নির্ভর করতে এবং সকল অবস্থাতে তাঁরই সাহায্য আকিঞ্চন করতে শেখা চাই, তাহলে দেখবে তাঁর কৃপায়কত অঘটন ঘটবে। "--শ্রীমা

"পাহাড়ের পথে দুটি মাত্র দিক থাকে, উপরে ওঠবার দিক আর নিচে নামবার দিক, তুমি কোন দিকটাকে তোমার পিছনে রেখে চলছ তার উপরেই সবকিছু নির্ভর করছে। "--শ্রীমা

"কামনাকে খুশি করার চেয়ে তাকে জয় করাতেই বেশি আনন্দ। "--শ্রীমা

'লোক-দেখানোর ইচ্ছা যাতে এসে পড়ে এমন সব-কিছু জিনিসকেই আমাদের যত্নের সঙ্গে এড়িয়ে চলতে হবে। "---শ্রীমা

"নিজে ভিতর থেকে রাগকে তাড়ালেই ভয়ও আপনা থেকে সরে যাবে। ''--শ্রীমা

"সবচেয়ে বেশি সাহসের কাজ হলো নিজের দোষ স্বীকার করা। "--শ্রীমা

"হিংসা ও তার সঙ্গে কুৎসা করে কেবল তারাই যারা নিজেরা দুর্বল ও ক্ষুদ্র। তাদের উপর কোনো রাগ না করে করুনা করাই উচিত। ও-সব জিনিসকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করে আমাদের কৃত নিশ্চয়তার আনন্দকে অব্যাহত রাখতে হবে। "--শ্রীমা

"সুরুচিবোধ থাকাই কলাবিদ্যার কৌলীন্য"---শ্রীমা

"এই বিশ্ব সৃষ্টির মধ্যে আশ্চর্য জিনিসের কোনো শেষ নেই। নিজেদের ক্ষুদ্র আমিত্বের বন্ধন যতই ছাড়িয়ে যাবো,ততই সেই সব পরমাশ্চর্য জিনিস আমাদের চোখে পড়তে থাকবে। "---শ্রীমা

"আমিত্বকে ছাড়িয়ে যাওয়া সহজ কথা নয়। বাস্তব চেতনার ভিতর থেকে তাড়িয়ে দিলেও আবার একবার সে বড়ো হয়ে দেখা দেয় আধ্যাত্মিক চেতনার রাজ্যেও। "--শ্রীমা

"ধ্যানে বসলে প্রত্যেকবারেই নতুন কিছু মিলে যায়,কারণ তার মধ্যে প্রত্যেক বারেই নতুন কিছু ঘটে। "--শ্রী মা।

"দুজন মানুষ যখন ঝগড়া করে,তখন দুজনেরই ভুল থাকে। "--শ্রীমা

"কে কতখানি মহৎ তা তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষমতা থেকেই বোঝা যায়। "---শ্রীমা

"সরলতার মধ্যে বিশেষ এক অনির্বচনীয়সৌন্দর্য আছে। "--শ্রীমা